লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

লেখক পরিচিতি

ঔপন্যাসিক	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।
জন্ম পরিচয়	**জন্ম :** ১৫ আগস্ট ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ; ষোলশহর, চট্টগ্রাম। **আদি নিবাস :** নোয়াখালী। **পিতা :** সৈয়দ আহমদউল্লাহ (অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন)। **মাতা :** নাসিম আরা খাতুন।
শিক্ষাজীবন	**মাধ্যমিক :** ম্যাট্রিকুলেশন (এসএসসি), ১৯৩৯, কুড়িগ্রাম হাই স্কুল। **উচ্চ মাধ্যমিক :** আই.এ (এইচএসসি), ১৯৪১, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। **উচ্চতর শিক্ষা :** বি.এ. (১৯৪৩), আনন্দমোহন কলেজ; এম.এ (অসমাপ্ত), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন/ পেশা	**সহ-সম্পাদক :** দি স্টেটসম্যান (দৈনিক পত্রিকা); **সম্পাদক :** সহকারী বার্তা সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক- রেডিও পাকিস্তান; প্রেস-অ্যাটাসে-পাকিস্তান দূতাবাস; **তথ্য অফিসার**- ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য অফিস; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক; ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট-প্যারিস।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩)।
জীবনাবসান	১০ অক্টোবর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ; প্যারিস, ফ্রান্স।

সাহিত্যকর্ম

ছোটগল্প	নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)।
উপন্যাস	লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮), দি আগলি এশিয়ান (ইংরেজি ভাষায়; রচনা ১৯৬৩)।
নাটক	বহিপীর (১৯৬৫), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উজানে মৃত্যু (১৯৬৬)।

ছন্দে ছন্দে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস : দি আগলি এশিয়ান এ চাঁদের অমাবস্যায় কাঁদো (নদী) কাঁদো লালসালু ফুটে উঠল।

নাটক : তরঙ্গভঙ্গ করে সুড়ঙ্গ করায় উজানে মৃত্যু হয় বহিপীরের।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ফেনী স্কুলের ছাত্রাবস্থায় (১৯৩৬) থাকাকালে হাতে লেখা যে পত্রিকা সম্পাদনা করেন- **'ভোরের আলো'** নামের পত্রিকা।
- তার প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম- **হঠাৎ আলোর ঝলকানি। (প্রকাশ : ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে)।**
- ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি ইংরেজি কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন- **সহকারী সম্পাদক পদে।**
- মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসে ইউনেস্কোতে কর্মরত থাকার সময় তিনি বাংলাদেশের মহান- **স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ার কাজ করেন।**
- তাঁর স্ত্রীর নাম- **এ্যান মেরি** (ফরাসি নাগরিক; বিয়ে : ১৯৫৬)।
- পি. ই. এন. পুরস্কার পান- **'বহিপীর'** নাটকের জন্য।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বড় মামি ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ পরিবারের মেয়ে, উর্দু ভাষার লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটকের- **উর্দু অনুবাদক।**
- ইউনেস্কোয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল- **১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বর।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যে চেতনা প্রবাহরীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটান।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পরিচিত- **কথাসাহিত্যিক হিসেবে।**
- ১৯৬৫ সালে 'আদমজী পুরস্কার' লাভ করেন- **'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।**
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কর্মজীবন শুরু করেন- **সাংবাদিক হিসেবে।**
- বাংলাদেশের কথাসাহিত্যকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পথিকৃৎ- **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।**

উপন্যাস : লালসালু

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থান বিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে- প্রদেশেরও। [illegible] নিরাশা [illegible] আর [illegible]

[illegible] ইতোমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারও জামা ছেঁড়ে, কারও টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারও-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা-যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না-কি করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? সেইটা পেলেই হয়-এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে [illegible] কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ ওঠে ছুটে [illegible] পানি খায়। পানি খায় ঠিক [illegible]

[illegible] সে দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা [illegible] সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা- [illegible]

[illegible] শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা [illegible] মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ [illegible] পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশতে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরু গলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুঁকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাঁড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরও আশা নিয়ে আলিয়া মদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দুরান্ত কোনো এক অতীত কালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতালার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরও ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলসানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারীতে চামড়ার লোক: কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ-এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়ত বাহে মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে-যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল-সেখানেও।

এক সরকারী কর্মচারী সেখানে হয়ত একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যান। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

– আপনার দৌলতখানা?

– শিকারি বলে।

– আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবির মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই। দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। ক্বচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-সাতবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে– মৌলবির গলা। বুনো ভারী হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়ত চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবির চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়ত।

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায়-মাঠপ্রান্তর আর-বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রং দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দু'জন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধান ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়। ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন- চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের এক প্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে- চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাইয়ের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়, তুলো। হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে ওঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে–নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটু শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা মুহূর্ত। দূরে যে কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান–হয়ে–ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের ঊর্ধাংশ কেঁপে উঠল, তীরের মতো বেরিয়ে গেল একটা কোঁচ। স-ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হাঁ করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

একসময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয় - সেদিকে দৃষ্টি নেই।

একসময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা- নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন তাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সেই চোখে একটুও কম্পন নেই।

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এই জন্যে যে, তার আগমন মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীর নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চিৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলি ছিল। জোয়ান মদ্দ কালু, মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

–আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়ত। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পিরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম খিচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

– আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ।

– মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভুঁইয়ে সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

..., খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রাসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে ... হয়ে যায়। তা ছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন ... কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর ... থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের ... ছুটে চলে এসেছে।

... ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

... একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন ...

... মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

... লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি ঘর করে ... আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে ... হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান ... বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে ... পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে ... মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝেছিল যে, ... সফলভাবে দুবেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা ...। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের আধোবদন চেহারা দেখে ... হয়ে গিয়েছিল অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও ... লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

... সাফ হয়ে গেল। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের ... মতো নতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের ... মতো সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল ...। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিল, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে ... হাওয়ারও ভাঁপসা গন্ধ খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠল।

... সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগল। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল ..., আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ... সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা-... পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি ... লাগল।

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা ঘর। ... হলো, গৃহস্থালি হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনে যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনে প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়ত সামনের দিকে, ... কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ... মাসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে কৃচিৎ কখনো সে যে ... না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে ... চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তা ছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা ... কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের ... অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল।

শেষে সেই মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম তার রহিমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেল, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে ... হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

... তার শক্তি, তার চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। ... কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ ...টির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে। ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

- অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

-অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা- থেমে আবার বলে মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা বলেছে। মজিদের কথায় বাইরে সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। রহিমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

- অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াত শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়ত দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এল খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের জমি-সব জমি একান্ত আপন; কোনটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয় জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়ত কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি- তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলা মাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে-তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকের পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন, সে-জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্য তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা-ছড়াবার সময়-না তাকায় দিগন্তের পানে, না স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়ত চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলে পুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা. বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে-মন-কে মন।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সঙ্গে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়ত না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে এবং হয়ত তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়ত করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দী হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলায় তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরেতো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাঁট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ-কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।
মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা ছুত-পূজারী। তারা গুনাগার।
জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে।
বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা–এ কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদ আত্মবিশ্বাস পায়।
মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,
– কলমা জানো মিঞা?
ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুখে লজ্জার হাসি।
গর্জে উঠে মজিদ বলে,
– হাসিও না মিঞা!
থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।
সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে।
চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,
– আমি গরীব মুরুক্ষ মানুষ।
খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে– গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।
এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,
– কলমা জানস্ না ব্যাটা?
সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।
খালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি– যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান– সেখানে একদা এক মক্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত।
অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।
– ব্যাপারীর মক্তবে তুমি কলমা শিখবা।
ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,
– গরীব মানুষ, খাইবার পাই না।
লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়ত মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে-কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।
মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,
– হইছে হইছে, ভাগ।
সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখানে থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রাম নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।
নীরবতার মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক; প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ওই সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।
মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহিমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ গ্রামেরই মেয়ে রহিমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ী পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত– সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলে চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।
রহিমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন শ্রান্ত চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোনো বেয়াদবি করে বসে সে-ভয় বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারে কেন মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন– যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ-যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?
কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহিমা একটা আর্জি জানায়। বলে তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালুকাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে– না-হয় লজ্জা, না-হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আড় অকর্তিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে একবার সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রুপালি ঝালর। রহিমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে আকাশের মহা-তমসার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে! ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।
কোনোদিন রহিমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও পাড়ার ছুনুর বাপ কঠিন রোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে; তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে–তার ওপর করুণা কর, রহমত কর। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।
অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহিমার কাছে। যেমন আসে খেতানির ভানুনি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিল, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,
– আমার এক আর্জি।
এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহিমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,
– আমার আর্জি-ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।
এবার ঈষৎ হেসে রহিমা বলে;
– ক্যান গো বিটি?
– জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।
সকৌতুকে রহিমা প্রশ্ন করে,
– তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?
সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।
– তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু।
রহিমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।
একদিন হাসুনির মা এসে বলে,
– আমার এক আর্জি বুবু।
– কও?
– ওনারে কইবেন– বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।
কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহিমা প্রশ্ন করে,
– ওইটা আবার কেমন কথা হইল?
– হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।
বুড়ো বাপ তার ঢেঙ্গা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কোঁকড়ানো। কিন্তু দু'জনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাঁপিয়ে–ঝাঁপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।
তাহের-কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙ্গল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে– আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।
অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,
– হুনছস কথা, হুনছস?
ছেলেরা সমস্বরে বলে,
– ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শেষে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে হবে ফেলে। কাদের বোঝায়,
– খবর দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।
কথা নিয়ে মায়ের উত্তর শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, বুকে ঘৃণা হয়। তাই রহিমাকে এসে বলে কথাটা।
– বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক– নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার।
উত্তেজনায় রহিমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,
– তুমি দুখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।
হাসুনির মাকে তার ভালোই লাগে। দুস্থা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে থাকে। বাড়িতে তিন-তিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, তাতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ- পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার শরম করে যায়।
রহিমা বলে,
– স্বামীর বাড়িতে যাও না ক্যান?
– ওরা খুশি না।
– নিকা কর না ক্যান?
কয়েক মুহূর্ত থেকে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।
কিন্তু তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠে যখন ফসলে অন্তরে তার রং ধরে। বতোর দিনে বাড়ি বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,
– শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?
বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,
– ...বেটি নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!
মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে ক্যামনে খাইছস্?
হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে,-গিলা খাইছে! মা-বুড়ী আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিত।
দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। মনে মনেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়: নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?
কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।
পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে– তোমার বিবি কী কয়?
বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে।
মজিদ ধমকে ওঠে।
– কও না ক্যান?
ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,
– তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যাম্‌নে কই?
কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারী গলায় বলে,
– আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মর্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে। চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়ত সে শেষই হয়ে যেত-যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,
– বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান-
আবার কতক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,
– বিবিরে কইয়া দিয়ো, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবত হইব।
মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেকে মাথা চুলকে বলে,
– হুজুর, কোত্থিকা হুনলেন বেটির কথা?
– তা দিয়ে তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো-কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।
সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বলল কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।
এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমির সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা-মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমি মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি–যা দিয়ে একজনের পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়ত তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিলো সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মতো কথা ফুটত মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।
বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর ঝাল হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।
বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে কি হাসুনির মা বলছে? তার তো ও বাড়িতে যাতায়াত আছে।
একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।
যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। সে বলেছে সেকি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না-তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন? তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে? এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিল, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হত কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব উঠেছিল।

একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে কাণ্ডটি নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।
অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলো হাসুনির মাকে। দেখেই চড়চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা– ওরে ভাতার-খাইকা জারুনি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?
প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।
সে দিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর সে ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফুরন দিচ্ছে।
হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহিমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। প্রথমে কিছু বোঝা গেল না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এইটুকু বোঝা গেলো যে, সে রহিমাকে বলছে : ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে।
মজিদ হুঁকা টানে আর চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে– এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোন কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।
পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এই জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।
অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে রহিমাকে বলে,
– ওরে যাইতে কও। আর কও আমি দেখুম নি।
একটু পরে রহিমা বলে,
– ও যাইবার চায় না। ডরায়।
মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুঁটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্যে এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে– থাক তাইলে এইখানে।
অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেড়া বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা, অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।
খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তি বিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদেই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।
একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো। খালেক ব্যাপারী বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,
– তোমার বিবি কী বলে?
মুখ না তুলে বুড়ো বলে,
– হেই কথা আপনারা ব্যাকই জানেন।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

– এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো– এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

– এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগি ঝুটমুট একখান কথা কয়– তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে উঠে বলে,

– কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে, –কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও।

বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারী আবার বলে,

– তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান!

–আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি!–লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে– বাইরে যত ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিল সে, এবং ভেবেছিল তার পক্ষে থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, –ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে।

পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে সে, মনে হয় ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষ গুণ সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্তাও আছে। তাদের মধ্যে গুনাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরি বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে– তারা এইসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু, সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না সে। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

– পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর নিকট বাণী এল; মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কি করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়ে হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব-যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে; তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল। হজরতের এত পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগল। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবদ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতলা মানবজাতিকে বললেন-

থেমে বিসমিল্লাহ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত পরে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝংকার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে-লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়েছিল, তারও চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নাবায়

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদের সুখ-শান্তির জন্যে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালো ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু সে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়-তার গুনাহ বড় গুণাহ, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

– তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কি মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস ঠাস জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ– এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচত, হাসিখুশি উচ্ছলতায় চারিদিক আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠেছিল সে কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমালান দেখাত না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ স্মৃতি কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস-তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

– কী মিঞা? তোমার দিলে কী ময়লা আছে? তুমি কী ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধ নিঃশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যেই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

– কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

– কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, খই পাচ্ছে না কোথাও।

– তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইয় ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে বেয়ে আসে, ঝরে ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে; ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

– তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাফ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পইসার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তালিম করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সেকথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে-কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে চেলাকাঠ দিয়ে এ মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ ছেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠেই না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

– দেখত, ব্যাটা কি মরলো নাকি?

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

- তাই কও? আমার কি তেমন কপালডা!

তার মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বড় ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় হে, সেখানে যা বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে, উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

- বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দুদিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শোঁ করে নেমে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মার হই হই করা অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেলো রে, ছাগলটা কোথায় গেলো রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেলো রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপজাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুরকুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য শূন্য ঠেকে। বলে,

- আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধে রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিড়ে কটা গলাধঃকরণ করে বলে,

- পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।

বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

- আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে। দু'দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে, -মাইয়া, তোর কাছে মাফ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে হু-হু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো চলে গেল। কেউ বলতে পারল না গেল কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে ত্রিশ ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে নদী কোথায় কত দূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্যে এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি মধুর কোরান তেলাওয়াত শুনেছে অনেক দিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

-আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে উঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা–।

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ– যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে-সব খোদা ভালোর জন্যেই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্যে নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে উঠেছে কিনা জানবার জন্যে কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া-না-হওয়া বা খেতে পাওয়া না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির করেছিল-যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

এ বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চির নীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়-সে কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মা'র মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

– খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মা'র প্রতি অগ্নি দৃষ্টি হানে।

– বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্রথম প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসত না। লজ্জা হতো। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে ক্রমে আসতে লাগল। কখনো কৃচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াত, আর বুকটা দুরুদুরু কাঁপত ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেলো তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেল। মজিদের হাতে হুঁকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

– হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুঁকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুঁকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে ক্রমে সে খোলা মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষ তো রহিমা আর সে। ধান এলানো মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা-কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরোনো আর্জি জানায়। রহিমাকে বলে,

– ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহিমা রুষ্ট স্বরে বলে,

– অমন কথা কইওনা, ঘরে বালা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রঙ, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

– আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনির একটা জামা দিলে ও পরত খন।

হঠাৎ কী হয়, রহিমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসত। আজ হাসেও না।

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহিমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ-রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে শিরশির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময়ে মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ গলার জন্য যে– রহিমাকে সে লক্ষ্য করেনি, সে-রহিমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী, অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহিমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

– পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহিমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করন লাগবো।

থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। যে মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারী হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ।

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা? তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভু ও অস্থির–অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহিমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিদ্ধ হয়েছে কি-না। সেও তাকায় না রহিমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পুব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দু'জনে চমকে উঠে। মজিদ কখন উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যুষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের যে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে উঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বলে আর তানার দোয়া।

শুনে কারও কারও চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহংকার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারও কারও বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়– বর্ষিত না হয় তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারি কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজকামকে অবহেলা করতে বলেননি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

– বলে মজিদ চোখ পিট পিট করে– যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে।

যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

– খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে-রহমতের জন্যে সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারি করে। কিন্তু আবার দু-মুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কল করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

তার যে-চোখে দিগন্তে প্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

– তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতিবিতি করে বলে, যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মণ ধান হলে অন্তত একশো মণ বলা চাই। বতোর দিন উঁচিয়ে-উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয়নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না ওঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ এবং যে-আগুন জ্বলে উঠেছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই। গৃহস্থদের গোলায় গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পিরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির-যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেকে থাকতে ভরসা হয় না পির সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো, তিন গ্রাম পরে এক পির সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তার পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

পির সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিল তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একদা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্য-প্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এই দূর দেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পির সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ–অজ্ঞাত স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক স্থান থেকে পাঠান বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে–স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই-কেবল বৃহৎ খড়গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করেছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর ভারতে কোনো এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পির সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে-গল্প তাঁর রুহানি তাকত ও কাশফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানে খোনকার মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রুহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে দীনতা ব্যক্ত করে। কিন্তু এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে তা মহৎ ব্যক্তির দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মজিদ নিশ্চিন্ত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পিররা যখন আশেপাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন কিন্তু মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। অতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্য-সহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কী সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থমথম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পির সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পির সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তার নূরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারও চোখ ঝলসে যায় কারো এমন চোখ-ভাসানো কান্না পায় যে, তার এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পির সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারী বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহিমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আড় পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে, – আপনার কী হইছে?

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

রহিমা কিছু বলে না।

উত্তরের জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহিমা হঠাৎ বলে,

–এক পির সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

মজিদ এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

–মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহিমা দমে গেল। তারপর আর কোনো কথা হয় না। একটু পরে রহিমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের অন্তহীন বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

কখনো ভাবে, ঝালর-দেয়া সালুকাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, এদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলে দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে বেরিয়ে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে।

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

হঠাৎ তার চোখ দুটি চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা ওঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহিমার পানে তাকায়। পাশে যে অঘোর ঘুমে বেচাইন। তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিত হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌছলো তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার বাড়ির সামনেকার মাঠে লোকে-লোকারণ্য। তারই মধ্যে কোথায় যে পির সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পির সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পির সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সেই পাখাটা থেকে থেকে নজরে পড়ে।

জুতা তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল মজিদ। সামনে শত শত লোক সব নিশ্চল হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন নতুন সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পির সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করেছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে তালে ওঠা-নাবা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পির সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিঞা হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পির সাহেব সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে, হয়তো তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন যে, ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা বলে, কার ও বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে। আধ ঘণ্টা পরে শীতল দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে, এমনি সময়ে হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠল। একটা ঘোষণা মুখে মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল। পির সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পির সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠেছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব সময় শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পির সাহেবের গলায় কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধ ঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সো'য়ালে তুরা সো'য়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন– সোহবতে তো'য়ালে তুরা তো'য়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে)– তখন গোটা জমায়েতেরই সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পির সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল হয়ে ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা-সঞ্চালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকের সব ছুটে গিয়ে পির সাহেবকে ঘেরাও করে ফেলল। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারল ধরল, কেউ পা, কেউ হাত, কেউ আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পির সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এই আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য হলো না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায় হায় করে উঠল পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা, আর তা শুনে জমায়েতও হায় হায় করে উঠল। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এই মর্মে যে, তাদের পির সাহেব তো শূন্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়? পির সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারী পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনে দ্রুত বিস্তারের মতো পির সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে– না-দেখতে ছড়িয়ে গেল। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিল, এবার তারা মড়া-কান্না জুড়ে বসল। পির সাহেব কী তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারি ঢেউয়ের মতো সম্মুখে ভেঙে এল জনস্রোত। অনেক মড়া-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পির সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পির সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

– ভাই সকল, আপনার, কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেল।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ মাঠটা যেন কেঁপে উঠল। শতশত নামাজ-রত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠল।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

– যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামাজে ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করল,

– চেচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না। মজিদ বললে,

– কোন নামাজ হইলো এটা?

– কাহে? জোহরকা নামাজ হুয়া।

উত্তর শুনে আবার চীৎকার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পির সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্রমাস থেকে ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, দু'কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বললে,

– কেন, তখন তোগো পির ধইরা রাখবার পারল না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?

– মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কারও কারও মনে ভয়ও হয়েছিল– এই বুঝি পির সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে একে তারা ভিড় থেকে খসে এল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মতিগঞ্জের সড়কে ওঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিঃশ্বাসের নীচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকাল। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথচালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করল– ভাই সকলরা, সকলে অবগত আছেন যে, বেদাতি কোনো কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশল সহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্যে তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেলো, তাহলে তার শয়তানি রইল কোথায়।

ভণিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। আওয়ালপুরে তথাকথিত যে-পির সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে– যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সেই উদ্দেশ্যে তথাকথিত পিরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটু ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ঈমানদার মানুষ– যাঁরা জীবনে একটি বার নামাজ কাজা করেননি–তাঁরা খোদার কাছে গুনাহ্ করছেন।

এই পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে, ছনলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পির সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না। এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেল যে না, তা নয়। কিন্তু গেল অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পির সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্ণে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতা বগলে করিমগঞ্জ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেশত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল কতক্ষণ।

কালু মিয়া গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু'ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে, মস্ত ব্যান্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষাক্ষেত্র তার মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে,- পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে। ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।

ভাত-পাঁজা খাওয়া রসকসশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের। প্রথমে দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিয়ার বাপের সঙ্গে দু'চারটা কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুঁকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

–কোনো চিন্তা করবানা মিয়া। খোদা ভরসা। তারপরে বলে যে, হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদর যত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবা শুশ্রূষার শেষ নেই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরও শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বলেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কি-না তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও স্বচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পির সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু পুরুষ আগে দীর্ঘ পথ শ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে লোকটি এ-দেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পানসা হয়ে গিয়ে থাকলেও পির সাহেবের শরীরে সে ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিশ পাবার জো নেই। সে জন্যে মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাতদিন আরও খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিনগ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পির সাহেবের মনে ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর জইফ অবস্থা। এ বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাগরেদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গী ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পির সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উলটে তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাগরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেওয়া যাবে। সে-দিন কালুদের বল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্যে মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পির সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তেরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিল, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি বছর আস্ত আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পির সাহেবের আগমন সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়তো বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন তার জন্যও নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা বলবে, ওস্তাদের মার শেষ কাটালে।

কিন্তু মুশকিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালে পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্যে পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে করতে এ-দিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পির সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সেও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পির সাহেবের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজ্বারি, পেট-কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

– পানিপড়া ক্যান?

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে, তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলে ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পির সাহেবের ত্রিসীমায় আর তো ঘেঁষা যায় না, অবশ্য পির সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউ এর খাতিরে পানিপড়ার জন্য তার কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পির নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে নামকে অন্তরে অন্তরে লেবাস মুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিত্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পির ডাকা। এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক–যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে–বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কি করে এমন খাপে খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দু'জনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

একজনের আছে মাজার, আরেকজনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্যে সে ভাবিত হয়, দু'দিন আমেনা বিবির কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় স্থির করে ব্যাপারী।

ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলা মিয়া। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায় দায় ঘুমায়, আর বোন জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে আড়ালে থাকে। কৃচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়তো বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে : একটা কাম করেন ধলা মিয়া?

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অস্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পলাই-পলাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে,

- কী কাম দুলামিয়া?

কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথমে বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতা সহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় এবং আওয়ালপুর তাকে রওয়ানা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে, যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ গ্রাম থেকে গেছে এ কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পির সাহেবের দোয়াপানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান বন্ধুর একটা ছেলের জন্য বড় সখ হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এই যে শেষ, পর্যন্ত কোনো ছেলেপুলে যদি না-ই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পির সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরুব্বি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। শালার মুরুব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

- কি গো ধলা মিয়া, বুঝলান নি আমার কথাডা?

- জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাত করে ধলা মিয়া জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিছু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা বড় তেঁতুল গাছ পড়ে এবং সবাই জানে যে, সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেবংশি। কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কী একাকী ঐ তেঁতুল গাছের নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিল যে, যে-সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের ফাড়াটা কাটলেও সেখানে গিয়ে পির সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাত সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা ধলা মিয়া।

- ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

- জি, কিছু না!

শুধু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,

- মরেক কথা। কথাডা জানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

- তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিয়া ভাবে, ভাবে! ভাবতে ভাবতে ধলা মিঞার কালা মিঞা বনে যাবার জোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুঁকায় টান দিচ্ছিল, হঠাৎ সেটা নামিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢং দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়– তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,

- আপনার লগে একটু কথা আছিল

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে দীর্ঘ ভণিতা সহকারে আমেনা বিবির মনে ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর রং ফুলিয়ে, এখানে সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলা মিয়া কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিয়াকে ডেকে বলে দিল, আওয়ালপুরে গিয়ে পির সাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

- তা কখন যাইবেন, আওয়ালপুর?

ধলা মিয়া হঠাৎ ফিচকি দিয়ে হাসে।

- আওয়ালপুর গেলে কি আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি-পড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারির মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব?

–আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা আর কথাডা একদম চাইপা যান। অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়। তার পানে চেয়ে আর দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলা মিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

- কী কন?

- কী আর কমু। এইসব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত না মামলা-মকদ্দমা? দলিল দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলা মিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পির সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়ত ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলা মিয়া বলে,

- আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পিরের কাছে আমি যামু না।

- যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্ট স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিয়া যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলা মিয়া বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

- হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামু নে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলা মিয়ার মতলব, শেষ রাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পির সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্যে ব্যাপারী যে টাকা দেবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

- তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য।

তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক-বিবেচনার কাম। টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে।

- না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলা মিয়া বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। খাতিরে ব্যাপারীর মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ করে সেই ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্যে সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার মতো।

ধলা মিয়া ভারীমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু'জনে গরু ছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে! মজিদের ধামড়া গাইটা পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহিমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে মজিদ। তারপর একসময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

- হেই পিরের বাচ্চা পির শয়তানের খবর কী? এহনো ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সটকাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাক-ধোঁয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং সে চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

- কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়ত গেছে গিয়া। মজিদ আস্তে বলে,

- তাইলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

- লোক পাঠামু তানার কাছে! বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

একবার সজোরে কেশে ধসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙ্গা করে তুলে ব্যাপারী বলে,
– হেই কথা আমিও ভাবতাছি। আছে কি না আছে হুদা-হুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সঙ্গীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন বোঝান আর কী। ঠণ পিরের পানি পড়ায় কী কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু।

কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুঁকায় জোর টান দিয়ে একপাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মতো বিত্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়-শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরও বলে যে, খলা মিয়াকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ গ্রামে কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে। কারণ, তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

খলা মিয়ারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ডুবা পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই...

মজিদ বাধা দেয়। খলা মিয়ার গুণকীর্তনে তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,
– খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠণ-পির বেশী হইল? আমার মুখে কী জোর নাই?
– আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দুর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।
– কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কি, ভাগো কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। ভাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মস্ত গোঁফে আর ঘন দাঁড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,
– ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কি করি এহন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।
– তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,-পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারও পড়ে সাত প্যাঁচ, কারও চোদ্দো। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপর হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দো প্যাঁচ।

ব্যাপারী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,
– আমার বিবিরডা ছাড়ান যায় না?
– ক্যান যায় না। তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগবো কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে, মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে-তাই তাড়াতাড়ি বলে এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহরি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারও সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যায় দিকে এফতার না করে মাজার শরীফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,
– আর সাত পাকে যদি ব্যথা না উঠে?
– তয় বুঝতে হইবে যে, তানার চোদ্দো প্যাঁচ কি আরও বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। একসময় আড়চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরও দু'চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ ওঠে পড়ে।

– ফেরবার পথে মোল্লা শেখের কাছে কাঁঠাল গাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরও কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাঁড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,
– কী গো হাসুনির মা?

সে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিল সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাসখানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিল মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে খুসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,
– কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট বলে,
– মা মরছে!

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,
– আহা, ক্যামনে মরলো গো বেটি?
– অ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,
– ছ্যামড়ারা কই?
– আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।
– দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছেনি?
– করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়াব।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,
– মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিলনি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।
– মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না!

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ সময় কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারও মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কোঁকড়ানো রগ ঝোলা যে মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদম গাছের তলে কবর দেওয়া হবে, তখন হয়ত দমকা হওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে কবরে লোক চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করবে-একথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,
– মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাঁধে। থেমে বলে,
– খোদা তারে বেহেস্তে-নসিব কর, আহা!

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়ত বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্যে লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ ক্বাজা হবে না তো?

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পির সাহেবের পানি পড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিল, কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আস্তে আস্তে একটা ভয়ও এল মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদ্দো কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউয়ের তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা গুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারও সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেখে-যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত খানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহিমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে এমনি পানি নয়-পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা। একসময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

–আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

–দেই নাই।

–নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। – তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার পাঁচা?

লজ্জার হাসি হেসে বলে,

–তিনি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এমনিই বোঝে।

–তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

মুশকিল পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়! বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহিমা আস্তে বলে,

–তিনি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে ফেরে রহিমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

–পড়া পানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

–না! যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

যখন দিগন্ত সীমার কাছাকাছি পৌছেছে তখন জোয়ান মদ্দ দু'জন বেহারা পালকি নাগাল অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

ক মিনিটের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারী হাঁকে, –কই তৈয়ার হইছেননি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরীফ পড়ছে। দুপুরের দিকে তবু কিছু জৌলুস ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানোর অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

–ও বুবু, সময় হইছে।

শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীত-বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরীফ বন্ধ করে, গেলাফে পরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে যেন ভেঙে পড়েছে। গায়ে মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে ক-ঘণ্টায় যে ভয় দীর্ঘ রোগভোগ মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারে সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তার কথা হচ্ছে কী, তেরো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে, প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। সে শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, কিছু বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে ভয়েই দু'কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে ভয়ের জন্যেই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে সেরা দয়ালু সে খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো বা পারত, মেয়ে-লোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা করে না। এ সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে, সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহারারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখল।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, – নাববো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

– তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, -তানার ওজু আছেনি?

ব্যাপারী ছুটে যায় পালকির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে, –আছে নি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে?

–তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ চিকন সুরে দোয়া দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পালকির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্যে আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ, পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য আরও সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পালকি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নতুন বউ এর মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মাণ নতুন বউ এর আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে আলোর সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে শক্তি বিদ্যুৎ চমকের মতো শতফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তথাপি মহা আকাশের মতোই সে মাজার প্রগাঢ় নীরব, আর মহা আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে নীরবতা। যে আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্ম সুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

– তানারে বইবার কন।

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

– বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজরের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সে আবার চোখ বুজে থাকে। মনে হয় তার শান্তি হয়েছে, আর আশা নেই। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়ত মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্যধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেওয়ায় হয়ত-বা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ নিঃশব্দতার মধ্যে গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পা-ই তার মনের সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেত। এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হাওয়া রোগ-জীবাণু-ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, আসে উন্মুক্ত বিশাল আকাশ পথে যেখানে কাদামাটি লাগেনি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে বসে থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারে নি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই চক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

– পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝংকার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করায় অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি। তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, ঢক ঢক গলা দিয়ে ঢেলে দেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির ম্লান আলোয় মনে হয়, সে-হাত শুধু সাদা নয় অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন মজিদ বলে, -তানারে উঠবার কন। এখন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

–আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তল থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে: একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

একপাক, দুইপাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা বছরে বছরে যে বাসনা অপূর্ণ থেকে আরও তীব্রতর হয়েছে কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটি মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব অভিযোগ নেই। একটা প্রখর অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

একপাক, দুইপাক, তারপর তিনপাকে অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়ত-বা-তাকে আবছা দেখলও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখল না, জানল না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানল না মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক'পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠতো।

ব্যাপারী বিদ্যুদ্গতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে, -কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহিমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়ত আসত যদি না সঙ্গে থাকত ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিল। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিল। রহিমা মনে মনে স্থির করেছিল, পাক দেওয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফিরনিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু'দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্পও করবে। নিজে সে স্বল্প-ভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যা-ই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহিমা যে-দৃশ্য দেখল তারপর গল্পগুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো পাঁজাকোলে করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরি করা ফিরনির কথা বা পান খেয়ে দু'দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেলে।

মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইল, দু'জনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুঁকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেল। দু'জনেই এক এক করে হুঁকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানিপড়া খাবার সখ হয়েছিল সে আমেনা বিবির ওপর, আকার ইঙ্গিত বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিলো। তবে একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে স্থির করেছিল। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিলো। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফক্কে গেল, যে মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না। দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখাল, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিলো।

হুঁকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,

– দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, –রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানি-পড়াডা দিলাম তা কিসের জন্য? শরীলে তাকত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে একমাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

-তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

আপনে তানার স্বামী ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আস্তে হুঁকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত টাটকা লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথাহত প্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচমকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে বলে,

– কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোনো কথা আছে?

একবার বলে বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে মাথা নেড়ে বলে,

– না কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে! তেরো বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবি আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে, তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নার পানে বেদনাভারী চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

– কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছেনি?

ব্যাপারী ভারী আস্তে বলে,

– আছে।

– হে তহুর বাপের কথা মাইনষেরা ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন? যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

–ক্যান?

–কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইল এই : পাক দিল আর গুণাগার দিল এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তার শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক বাঁধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে-বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তালাক দেওয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুণাগার হয়েছে, পাপীও মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল আর কখনো করবে না।

হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে করল,

কী কিছু সন্দেহ করেন?

কোনো কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, ঘুরে পড়ে গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই খোদার কালামের যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইয়ের মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু না, তানারে তালাক দেন।

যমুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়াল। প্রশ্ন করে,

কী গো বিটি?

হুঁস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন।

হাত ছেড়ে ব্যাপারী উঠে দাঁড়াল। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পালকিটা পাঠিয়ে দিলো।

বিবিকে নিয়ে সে পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মজিদ বৈঠকখানার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, দাঁড়িয়ে মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেল। মনের কথা জানা গেল না।

এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য- আবছা দেখা কালো পাড়ের নিচে একটা সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখল না হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। সে ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

দোয়া-দুরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়। এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ- বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেত, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

হুঁকার নীলাভ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে সঙ্গে হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্তনেস্ত একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই, আরেকবার মনে হয় সে শব্দটা উচ্চারণ দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না; চলনে বলনে বেহায়াপনাও ছিল না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

কথাটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুঙ্কার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমন কাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং সকল সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে ঝাঁ ঝাঁ ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারী কী কখনো করেনি? ব্যাপারীর মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়ত অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে। এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সে-দিনের পাল্কিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায় নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পাল্কির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসত। সেটা হলো খোতামুখের তালগাছটা। বহুদিনের গাছ, ঝড়েপানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পাল্কির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝত যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ওইখানে কেমন একটু অন্ধকার। কাছে গিয়ে হাত তুলে দেখে ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাগুলো খসে এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে শৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে, এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়। অবশ্য দু'বছর তিন বছর অন্তর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয়, এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারীই। খরচ করে তার আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরনো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে সে-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রং চটে যায়, বা সালু-কাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া- তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারী হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কী ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্যে আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে আবার করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা বিড়বিড় করে বলে, –তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালু-কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারী। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাটবেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এই জন্যে আরো বেশি বোধ করল যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিরা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখল না। ভাবলে, বিদেশি হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা দু'দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেলো। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে দু-দুটো মক্তব বসানো হয়নি? সে-কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখানে দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগল চরকির মতো। ইস্কুলের জন্যে দস্তুর মতো চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদন-পত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্যে সরকারের সাহায্য চাই।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনো প্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল,

– কী হুনি ব্যাপারী মিঞা,

ব্যাপারী বলে-কথাডা ঠিকই ।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্কাস এলো, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এলো। আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা। সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্যে মুখ খুলেছে-এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এল। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রগ। ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে,

– তোমার দাড়ি কই মিয়া?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইস্কুল হবে কী হবে না- সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারও ছাঁটা, কারও স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারও বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সেদিন গেছে।

– পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

– তুমি না মুসলমানের ছেলে-দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিশ্বাস রুদ্ধ করে ছিল এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

-আমি কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ-তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা। খালেক ব্যাপারী বলে,

– হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরেজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,

-আপনি যা হুনছেন তা সত্য। মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

তা এই বদ মতলব কেন হইল?

-বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজ-কাইল ইংরেজি না পড়লে চলবো ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুবির কথা কেউ কী কখনো শুনেছে। শোনো শোনো, ছেলের কথা শোনো একবার-এই এরকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে- দিনকালের কথা কইল তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতিগতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই, তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে! সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি? সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পরে পাঁচ-ওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি জপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত-আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজিদের এক'শ দোরদার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, ভাই সকল! পোলা-মাইনষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে– তা নিয়া আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরী ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুই-চারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তি বিধান হবে– এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে,

– বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন!

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক জানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন– আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এই সময় আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

– তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

–চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারও মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারও না কারও যেন যৎকিঞ্চিৎ হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এই ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। তার জীবন আর-কদিন আর খায়েশ-খোয়াব বা আশাভরসা নেই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনা সে-দিন মাত্র ঘটল। কানা-ঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাঁজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাঁজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চলান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোনো অন্যায় বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়ত দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

–ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে-এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে আধখানা ঘর আস্তই হোক-একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা পাকা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তা ছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমাট ভাবের পরে আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে? দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই। কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাক-পড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিল এই মহব্বতনগর গ্রামে। সে-দিন ছিল ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে এক হয়ত ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে-চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

এক এক হাওয়ার অকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে এবং তাই বুকটা কেমন কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসাভাবে, ধীরে ধীরে সে সহসা কেমন অন্যমনা হয়ে যায়।

হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া দুরুদ পড়ছিল মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নামিয়ে শেষ করে শেষ করবে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে।

সালু-কাপড়টা এক কোণে উল্টে আছে।

সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসের ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, চোখে জাগ্রত দৃষ্টি সে স্থির হয়। হঠাৎ বাওয়ার মতো তীব্রভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের ম্লান আলোয় সে-উন্মুক্ত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

এ মাজারটা যদিও মজিদের সমৃদ্ধির যশ-মান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরটা, কিন্তু সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার জীবন হয়ে কবরস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে আজ ছুঁয়ে করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উল্টানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার কাছে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মতো অনাদি অন্তহীন এর কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

রাতে রহিমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের অনুগামিনী রহিমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে মনে ভাবে।

এক সময় মজিদই বলে,

– বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না তাই সহসা রহিমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর টেনে দিয়ে সে আস্তে বলে, – আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি।

– হেন মোটা-তাজা পোলা।

এবার মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

– নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে একটা কথার মহড়া দেয়। সে অবশেষে কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তার অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মত ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিজের রক্তের এবং বক্ষের কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহিমাও সে- নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি মনে নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

অকস্মাৎ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

– হায়, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখাচ্ছিল। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিল যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করলে পরে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্যে শরীরের রক্ত পানি করা, আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরীফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের চলা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, তাতে আর এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে-তাতে যেন কোরান পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহিমা কদুর বিচি শুকাবার জন্যে বিছিয়ে দিচ্ছিল। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অর্ধপরিচিতা কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

পরে মজিদ রহিমাকে বলে,

– বিবি, একটা কথা।

কথার জন্যে রহিমা পা টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

– বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম? সাথী মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহিমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহিমা কে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

– কী কও?

– আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহিমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে থেকে তার হাত থেমে যায়। সমগ্র জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছুই নেই।

জোতের কড়া রোদে মাঠ ফাটিয়ে আর লোকদের দেহ কালো-কালো হয়ে গেছে ফসলতিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয় এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, কার্তিশিল মেহমান জাঁকজমক হৈহুল্লুঢ় হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ুলছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ডর করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ডর করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায় দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আতরের গন্ধে ভুর ভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

– হে নামাজ জানে নি?

রহিমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

– জানে।

– জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহিমা সরাসরি উত্তর দেয়,

– পড়বো আর কী ধীরে-সুস্থে।

আড়ালে রহিমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,

– তোমারে হে মানসম্মান করে নি?

– করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালো। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু'জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে -এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝংকার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনেনি। রহিমা জোরে হাসে না। সালু-আবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে তারাও কোনো দিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখ বেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হুহু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝংকার ওঠে না কখনো। গোয়ালঘরের মতো মক্তবে পিটপিটে মেজাজের মৌলবীর সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা পড়া হতে শুরু করে অন্ন সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র অভ্যাস নেই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

– কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুক্ষতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওপারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

– মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহিমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলা নি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপরে বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে। বুনতে বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে উঠে রহিমা বলে,

– জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

– একটা মজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATI

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হাসি থেমেছে দেখে রহিমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

– কী কথা কইন?

– কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

– কও না।

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

– তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

– কারে দেখাইছিল?

– আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর-হঠাৎ আবার হাসির একটা গমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে-আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে-হাসি থামতে দেরি হলো না। রহিমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেলো।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত ওঠে ভারী হয়ে থাকে। রহিমার অলক্ষ্যে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তারপর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহিমা যেন চমকে উঠেছিল তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝেঁকে চোখ-নাক মোছে।

রহিমা আস্তে বলে,

– কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্যে তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্যে মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহিমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিল এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহিমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দুদিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে, কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে-পূর্বাহ্ণে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহিমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ী মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল। কী তার বিলাপ, কী ধারাল তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে জাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খানখান হয়ে গেল। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, –সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে। ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রূহ-এর জন্যে দোয়া করা; সে যেন বেহেশতে স্থান পায়, তার গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায় তার জন্যে দোয়া করা।

কিন্তু এ-সব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ-চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুঁস নেই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেলো। দুপুরের আগে মজিদকে নিকটে কোনো এক স্থানে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, দূরে আসা চোখে আশপাশের দিশা নাই।

রহিমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহিমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

– ওইটার হইছে কী?

রহিমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গালের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

– মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

– কিন্তু... ক্যান খারাপ করছে?

রহিমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

– ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐ রকম কইরা বসে না।

মজিদ হুঁকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ার হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী-তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢং? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে। বলে, আমার দরজার থিকা উঠবার কও তারে। ও কী ঘরে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহিমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটু কূল-কিনারাহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে– এই ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শনের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারাল তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়ত এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে-শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকি ধিকি করে জ্বলে, মানে অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল-তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারী হয়ে এল। তারই ভারিত্বে হয়ত চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝল না, তারপর ধাঁ করে ওঠে বসল। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহিমা শোয়। সেখানেই রহিমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহিমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুসি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহিমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠে রহিমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুসি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

– জমিলা কই?

ঘুমাইছে বোধ হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে ওঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

-ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লাটবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত জানে? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছেনি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহিমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিল বলে সে-কথা সে জানে না।

-কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

-বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ওইসব ফাইজলামি চলে না।

যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহিমা নিরুত্তরে ভুসি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভুসি খেতে শুরু করে। কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে। রহিমা যখন ধীরে ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না। রহিমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহিমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়ত মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীতবিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে লাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলে না। নামাজ যে পড়েছে, এ-কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনোদিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ- যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে- সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে সে-ক্রোধ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহিমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

-ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কি রাগ করা যায়?

-রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এই বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই। এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এরপর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে-সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

-ওই দিলে খোদার ভয় নেই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সিঁথি কাটছে। তেল-জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ-সময় মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছগাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে-দাঁতের আশে-পাশে, ওপরে-নীচে। ঘষতে ঘষতে ঠোঁটের পাশে ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই-মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। একসময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুরঘাটের যেমন থাক থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে, তারপর বলে,

– রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

– তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্যে হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী? জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছ, তা কী শক্ত গুনার কাম জানোনি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কি ডরাও না, দোজখের আগুনরে কী ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

– তাছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আসো নাই তুমি! এই ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তাঁনার রুহের দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোসা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিতে তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মতো। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়ত তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সে-দিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল-মসলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহিমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সে-দিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মসলা এল ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের-আধাসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মসলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকেরা এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগল। কে একজন মোমবাতি এনেছে কটা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দু'পাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে এক গোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো এক ভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পড়েছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘত খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এই যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে-নামতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীরগতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীক স্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুনে চলে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু হু হু। আবার : হু হু হু। আবার–

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহিমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক–আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন একসময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে। বালু তীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহিমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল; চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহিমাকে ডাকে,

–বুবু!

রহিমা শোনে কি শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এ-দিকে ঢেউয়ের পর আরও ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চিৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারে না। এবার ভেসে যাবে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা–ভরসা।

বিদ্যুৎগতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে।

– বুবু!

এবার রহিমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে, কেউ-বা এ-হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে–আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটি লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে ধীরে সে উঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার দিকে তাকায়। একসময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,

– পাগলি ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এই বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সে-দিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়ত তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

– ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচাইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া–চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে,

– আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহিমা তখনো বসে আছে, পাশে নামিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহিমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এইবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

– হে কই?

রহিমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ ওঠে চলে গেল তারপর আর সে এ-দিকে আসেনি। আস্তে রহিমা বলে,

–বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

–ও যে একদম বাইরে চইলা গেলো, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহিমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

– হে বাইরে গেছিল?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

– হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে। পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিয়ন্ত হুঁকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিল মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধে হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহিমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বালা ডেকে আনবে আর মাজার-পাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহিমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে– বিবি শোনো। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তর পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহিমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে-দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

– বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলানি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহিমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয়,

– তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিমা । মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখ দুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙ-শূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো খিলখিল হেসে জীবনে প্রথম হয়ত কোমল হয়ে এবং নিজের মনের কথা ভুলে গিয়ে সে রহিমাকে বলে,

- কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়ের মতো কথা মজিদ বলে না। তাই কষ্ট করে রহিমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে উঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের ঘনিষ্ঠতার ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন আবরণ ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় দিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিকীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহিমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ গলাটা নিচে রহিমা বলে,

- কী কমু? মাইয়াডা জানি কেমুন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে উঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে যেই সে উঠানে নেমেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছ! খালি তা না, তুমি তাঁনারে নারাজ করছ। আমার দিলে বড় ডর [illegible] হইছে। আমার উপর তাঁনার এহবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে, -আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়া বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিত। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইবো, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তাঁর চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

-শুনছ নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরও রুক্ষ করে সে বলে,

-শোন বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছ তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এই কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

-তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষেরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার-ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। মাজার-ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এল তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে সে বেরুতেই মুহূর্তে সে-আওয়াজ থেমে গেল। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করল মাজার-ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে। আবার বাইরে গেল, আবার এল ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার-ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এল। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এল তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করল মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যা-হোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে এত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজার-পাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে মনে মজিদ কিছুটা খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

- তা তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠা বসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহিমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। ওঘরে মজিদ হুঁকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। রহিমা অজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন ঘন হুঁকায় টান মারে আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহিমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে-পা টেপে রহিমা, ঘুণধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে, তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুঁকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওধার হতে থেকে থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে ঝংকার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। একসময়ে রহিমা আস্তে উঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভাব নামে। একটু পরে সহসা জেগে উঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীরে ধীরে মজিদ ওঠে। ওঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে-এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নেই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে উঠে তাকায় মজিদের পানে। প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারী যে, গলা ছেড়ে চিৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

- তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয়, ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহিমা পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছিল, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদা তাআলার ন্যায়বাণী, তার নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহিমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে উঠে বসেছিল, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে উঠবার আগেই জমিলা সুস্থির হয়ে দাঁড়াল, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকাল। হয়ত ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখল। তাতে হাত বুলাল না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেল না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললে বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে, কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিল, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিল জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসল জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পেছনে পেছনে রহিমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এত বুঝল না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহিমার পানে তাকাল। তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,

– হে আমার মুখে থুথু দিল!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল রহিমা,

– কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহিমার চিৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোনো কথাও বলল না। আরও কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাতকাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠোর মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নেই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নেই। তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখলে না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরও কঠিনতর করে তুলল। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে। ভেবেছিল, হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকল মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিলো মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয়, চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে–তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে– এমনি সময়ে বুক ফাটা কণ্ঠে মজিদ হো হো করে উঠল। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দুফাঁক করে দিল। সভয়ে চমকে উঠে জমিলা তাকাল স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণায়মান, তার অশান্ত উদভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠল। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেলো। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নামা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মজিদও ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়াল। জমিলা দেখল পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নেই; সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এইটুকুন পথ পেরোবার উপায় নেই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এই সময় সে বলে,

– দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূত-প্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারও আছর আছে। না নইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশোনির ভাব জাগল না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমড় বাঁধল। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

–তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারাল ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এই সব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক প্রহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পালাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বলল,

–ঝাঁপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাঁপ দিয়ে চলে গেল।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহিমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

–হে কই?

–মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পালাইবো হে-জিন।

–ও ভয় পাইবো না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

– কি যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের। দম খিঁচে ক্রোধ সংবরণ করে সে আবার বললে,

– তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহিমা ঘরে চলে গেলো। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইল। যে-কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে –এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুলল। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরও দূরে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুর থেকে থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নাই।

আরও সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে-শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

…! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরুপায় দৃষ্টি দিয়ে পশ্চিম-পশ্চিম … হবে দূরপশ্চিমে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে … ইতিমধ্যে রহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ … না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা … কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই …, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে অপেক্ষা যুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উৎকণ্ঠা … কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে বসে মেঘ দেখে।

… বিদীর্ণ হয়। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে উঠে … হয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে … মজিদ চিরে দু'ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে- … খাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে … চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা … অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ … অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত, প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন … তাকে ঘুম না দিয়ে, আরাম না করে। হয়-ত-বা সে এবাদত করে। … শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত। … অসহায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে … না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির … ওঠে না। প্রকৃতি-অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে কিঞ্চিৎ … হবে যেন, কারণ ভ্রূর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

… হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো …, উঁচু হাওয়ার ঝাঁপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের … মজিদ ওঠে আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, … মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার … যে রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নতুন দিনের … মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল-ফালাক। … আকাশে আগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ … মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে-অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, … তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় …, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

… প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। … তীরের ফলার মতো সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে … শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম … এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে … শব্দসংকেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

… মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু'পা … ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলা বৃষ্টি শুরু হইছে!

… প্রভাতের অপেক্ষায় রহিমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। সে কোনো … দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

-বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

… এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ … সে-দিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে- যে-দিন সাতকুল খাওয়া … বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিল।

… আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, … শিলাপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা … আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়ত, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে … হয়রান হতো। বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে … খেলার ছিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোড়ে খোদা।

…-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে- তা দিন- … যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর-কচি ধান ধ্বংস … যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ … তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকোর যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে …, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহিমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলোমেলো মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার দুটি দরজার কাছে যায়, সাদা মতো উঠানে জোরে পাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার কোথা থেকে পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। এক সময়ে রহিমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

- কী হইল তোমার? দেখো না শিলাবৃষ্টি পড়ে!

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহিমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোলা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহিমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অথবা নষ্ট হলে যে আফসোস করে সারে না, সে-ই মাঠে কচি-নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে এবং যে-রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

- কী হইল তোমার বিবি?

রহিমা হঠাৎ পা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

-ধান দিয়া কী হইব, মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা কেমন করে একটা ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাঁপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না। এমনকি তার মুখের একটি পেশিও স্থানচ্যুত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহিমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

- মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে, মজিদের ইচ্ছে হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

- না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর জ্বর এখনো কাটে নাই। আছর পড়লে এই রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহিমা তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘনঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্পমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে।

মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

- দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারও মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে- সব তো গেল! এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

- নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখ।

- এরপর আর কারও মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

❖❖❖ সমাপ্ত ❖❖❖

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শব্দার্থ ও টীকা

নলি	জাহাজে চড়ার অনুমতিপত্র।
শস্যের চেয়ে টুপি বেশি	ঔপন্যাসিক যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে প্রচণ্ড অভাবের পাশাপাশি মানুষগুলো ধর্মভীরু। খাদ্য না থাকলেও মানুষের মধ্যে ধর্মচর্চার কার্পণ্য নেই –এটাই বোঝানো হয়েছে।
হা শূন্য	অভাবগ্রস্ত। দারিদ্র্য।
ঝিমধরা	অবসন্ন। স্থির।
জানপছানের লোক	আত্মীয়স্বজন। প্রিয়জন।
সরভাঙা পাড়	প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া নদীর পাড়।
হেফজ	মুখস্থ। কণ্ঠস্থ।
সরগলা কেরাত	চিকন সুরে কোরান পাঠ।
ফিকে দাড়ি	পাতলা বা হালকা দাড়ি।
বাহে মুলুকে	উত্তরবঙ্গ এলাকায়।
নিরাক পড়া	বাতাসহীন নিস্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া। ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।
গলুই	নৌকার সামনের বা পেছনের শক্ত ও সরু অংশ।
চোখে ধারালো দৃষ্টি	চোখের সূক্ষ্ম, কৌতূহলী ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।
চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা	তাহের-কাদের মাছ ধরছে। কাদের সন্তর্পণে নৌকা চালাচ্ছে। তাহের নৌকার সম্মুখভাগে-তার দৃষ্টি যেন সূচের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণতাসম্পন্ন। যেখানেই মাছ থাকুক না কেন-দৃষ্টির সূক্ষ্মতায় তা চোখে ধরা পড়বেই।
কোঁচ	মাছ ধরার জন্য নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র। মাথায় তীক্ষ্ণ শলাকাগুচ্ছ যুক্ত বর্শা বিশেষ।
জাহেল	অজ্ঞ। মূর্খ। নির্বোধ।
বেএলেম	বিদ্যাহীন। লেখাপড়া জানে না এমন লোক।
আনপাড়হ্	যাদের পড়াশোনা জ্ঞান নেই এমন লোক।
বেচাইন	অস্থির। উতলা।
চিকনাই	উজ্জ্বল। লাবণ্যময় চেহারা।
বতোর দিনে	জমিতে বীজ বপন বা ফসল বোনার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।
মগরা মগরা ধান	প্রচুর ধান। গোলা বা মোড়া ভর্তি ধান।
বেওয়া	বিধবা।
বেগানা	অনাত্মীয়।
গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহিমার সারা দেহে	সীসা একটি কঠিন ধাতব পদার্থ। আগুনে পোড়ালে তা গলে যায় এবং যে পাত্রে রাখা যায় তাতে ছড়িয়ে পড়ে সমান্তরালভাবে। মজিদের উপদেশ বাণী শোনার পর লজ্জা রহিমার সমস্ত শরীরে ওই রূপ ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি উপমা।
গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ	রহিমা মজিদের স্ত্রী। তার অনুগত ও বাধ্য। মজিদের ভয়ে সে ভীতও। মজিদের চোখের ভাষা বোঝে সে। তাছাড়া সে ধর্মভীরু। গ্রামের মানুষগুলোও তারই মতো একই রকম ধর্মভীরু ও মজিদের প্রতি অনুগত।
রুঠাজমি	অনুর্বর ভূমি, নিষ্ফলা জমি।
শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে	মেঘ বৃষ্টিবিহীন নীল আকাশকে কেমন উন্মুক্ত-ন্যাংটো মনে হয়। রোদের তাপদাহে মাঠ-প্রান্তরের মাটি ফেটে চৌচির। বৃষ্টি আর মেঘ শূন্যতায় আকাশকেই মনে হয় শূন্য। তার নীলের ভেতর মৃত্যু যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নেই যেন।
নধর নধর	কমনীয়, সরস ও নবীন।
দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে	অমাবস্যার দুইদিন পরের চাঁদ– দ্বিতীয়ার চাঁদ। নতুন ওঠা এই চাঁদের আকৃতি বাঁকা কাস্তের মতো। যে কাস্তে হাতে কৃষক মাঠের ধান কাটে আর মনের আনন্দে গান ধরে।
তাগড়া	বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া।
গাঁট্টাগোট্টা	খর্ব ও স্থূল অথচ বলিষ্ঠ দৃঢ় অস্থি গ্রন্থিযুক্ত; আঁটসাঁট দেহবিশিষ্ট।

শ্যেন দৃষ্টি	বাজপাখি বা শিকারি পাখির মতো দৃষ্টি।
ভূত পূজারী	যারা মূর্তি পূজা করে।
নছিহত	উপদেশ। পরামর্শ।
আমসিপারা	আরবি বর্ণমালার উচ্চারণসহ সুরা সংকলন। পবিত্র কোরান শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ।
তারস্বর	অতি উচ্চ শব্দের চিৎকার।
ধামড়া	বয়স্ক। পাকা।
মারুফ	মহান পুরুষ। মহাপুরুষ।
রুহ	আত্মা। অন্তরাত্মা।
মহা তমিস্রা	গভীর অন্ধকার। ঘোর অমানিশা।
মওত	মৃত্যু। মরণ।
ঢেঙা	লম্বা। পাতলা শরীর।
শয়তানের খাম্বা	খাম্বা অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। এখানে হাসুনির মার বাপ তথা তাহের কাদেরের বাপকে মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার সঙ্গে স্ত্রীর সর্বদা ঝগড়া লেগে থাকে। বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা মজিদের কাছে এসে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। তাহেরের বাপ কিছুটা বোকা ও একরোখা। এটি মজিদের মোটেই পছন্দ নয়। মজিদ ভাবে এ বুড়োই শয়তানের খাম্বা।
বাজখাঁই গলায়	গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে।
ঢোল-সোহরত	কোনো বিষয় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করা, প্রচারের ব্যাপকতা অর্থে।
নেকবন্দ	পুণ্যবান। মহাপুরুষ।
ছুরায়ে আল-নূর	পবিত্র কোরান-শরিফের একটি সুরা– যেখানে মানব জাতিকে আলোর পথ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি মূলত নারীদের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।
কেরাত	পবিত্র কোরান-শরিফের বিশুদ্ধ পাঠ।
হলফ	সত্য কথা বলার জন্য যে শপথ করা হয়। শপথ। প্রতিজ্ঞা।
রদ্দি	পচা। বাসি।
আমসিপানা মুখ	শুকিয়ে যাওয়া মুখ।
বালা	আপদ-বিপদ।
শোকর গুজার	কৃতজ্ঞতা। প্রশংসা। তৃপ্তি বা তুষ্টি প্রকাশ।
তোয়াক্কল	ভরসা। নির্ভর।
রুহানি অকত ও কাশফ	আত্মিক শক্তি উন্মোচন করা।
বয়েত	কবিতাংশ; আরবি, ফারসি বা উর্দু কবিতার শ্লোক।
বেদাতি	ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতির বাইরের কিছু।
জঈফ	অতি বৃদ্ধ।
কেরায়া নায়ের মাঝি	ভাড়াখাটা নৌকার মাঝি।
রেহেল	কোরান শরিফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো।
উচক্কা	অবাধ্য। ডানপিঠে। দুরন্ত।
শিরালি	শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যারা মন্ত্র বা দোয়া পড়ে।
বরগা	ছাদের ভর ধরে রাখার কাঠ বা লোহা।
হুড়কা	দরজার খিল।
বাজা মেয়ে	বন্ধ্যা নারী। যে নারীর সন্তান হয় না।
খোদার ঢিল	শয়তানকে তাড়ানোর জন্য বৃষ্টিরূপী শিলা।
নফরমানি	অবাধ্য।
বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ	চোখের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা বোঝাতে উৎপ্রেক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত।
লেলিহান শিখা	দাউদাউ করা আগুনের শিখা।
ঠাটাপড়া	অকস্মাৎ বজ্রপাত হওয়া।
নিতিবিতি করা	সংকোচে ইতস্তত করা।
তোয়াক্কল	বিশ্বাস। আস্থা।
রেস্তায়	সম্পর্কে। আত্মীয়তায়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

'লালসালু' উপন্যাস সম্পর্কিত তথ্যাবলি

- 'লালসালু' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়- **কলকাতা থেকে (কমরেড পাবলিশার্স)।**
- 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদের নাম- **L'arbre sans racines (১৯৬১, অনুবাদক- ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী অ্যান মেরি)।**
- 'লালসালু' উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ (Lal Shalu) করেন- **কলিমুল্লাহ।**
- 'লালসালু' উপন্যাসটির মূলসুর/বিষয়- ধর্ম নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারীদের স্বরূপ উন্মোচন এবং নারী জাগরণের প্রেক্ষাপটে সমাজচেতনা।
- 'লালসালু'র উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়- **করাচি থেকে (১৯৬০ খ্রি.)।**
- 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদের নাম- **Tree without Roots (১৯৬৭, অনুবাদক নিজেই)।**

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

- ...আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ-থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা।
- কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা?
- অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই।
- শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।
- ...চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না।
- ...সে ঠান্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই।
- ...করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে।
- ...নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়।
- ...ও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়।
- ...মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে।
- ...শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে।
- ...তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে- বাইরে যত ঠান্ডা থাকুক না কেন?
- ...দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?
- ...লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।
- ...চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।
- ...ঝরনার মতো বেয়ে বেয়ে আসে, ঝরে ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়!
- মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখির মতো আছড়াতে থাকে।
- ...সড়ক ধরে ত্রিশ ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে।
- ...অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?
- ...চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।
- ...বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কী যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে।
- ...আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য।
- ...কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়।
- ...কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই।
- ...কারও পড়ে সাত প্যাঁচ, কারও চোদ্দো। একুশ বেড়িও দেখেছি একটা। তয় সাতের ...ইইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দো প্যাঁচ।
- যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।
- আছে? ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে।
- পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে।
- তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ।
- মেয়ে লোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ।
- সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি।
- হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে।
- সে মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।
- মহা আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে নীরবতা।
- সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য।
- তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় এক বিন্দু রক্ত টাটকা লাল টকটকে।
- পাক দিল আর গুনাগার দিল এক সুতায় বাঁধা থাকে।
- হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠান্ডা থাকে।
- কিন্তু মজিদের এক'শ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।
- এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।
- আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই।
- এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে-চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।
- সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে।
- আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি।
- তানি বুঝি দুলার বাপ।
- মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ী মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল।
- ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐ রকম কইরা বসে না।
- ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস।
- জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস।
- কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া।

'লালসালু' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশ্লেষণ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অসাধারণ শিল্প কুশলতায় 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যে একজন কুশলী শিল্পী তা তাঁর উপন্যাসের চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। 'লালসালু' উপন্যাসের শৈল্পিক সার্থকতার পেছনে সুসংহত কাহিনিবিন্যাসের চেয়ে চরিত্র সৃষ্টি কুশলতার দিকটির ভূমিকা অনেক বেশি। বলা যায় লালসালু চরিত্র-নির্ভর উপন্যাস।

০১. মজিদ

'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ। মজিদ সমাজের একটি টাইপ চরিত্র হলেও উপন্যাসের নায়ক চরিত্র মজিদ। শীর্ণ দেহের এ মানুষটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য, ভয় ও শ্রদ্ধা, ইচ্ছা ও বাসনা সবই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক এ চরিত্রটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি এবং তার উপরেই আলো ফেলে পাঠকের মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছেন। উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রক মজিদ। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও কাহিনির ভিত্তিভূমি। যে কারণে বহিরাগত হয়েও মজিদের প্রবল উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়ে মহব্বতনগর গ্রামের সামাজিক-পারিবারিক সকল কর্মকাণ্ডে।

আলবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-১৯৬২), জাঁ পল সার্ত্রে প্রমুখ অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের অস্তিত্ববাদের প্রভাব মজিদ চরিত্রের মাঝে লক্ষণীয়। অস্তিত্ববাদের মূল বিষয় হচ্ছে ব্যক্তির অস্তিত্ব। মানুষের অস্তিত্ব দুটি কারণে বিপন্ন হতে পারে। খাদ্যের অভাবে মানুষের জীবন অস্তিত্ব বিপন্ন হয় আর বিবেকের অভাবে মানুষের মানবীয় অস্তিত্ব বিলীন হয়। নিরাকপড়া শস্যহীন জনবহুল নোয়াখালী অঞ্চলের অন্য বাসিন্দাদের মতোই জীবিকার প্রয়োজনেই মজিদও ছুটে ছিল ময়মনসিংহের দুর্গম গারো পাহাড় অঞ্চলে কিন্তু সেখানে সুবিধা করতে না পারায় সে মহব্বতনগর গ্রামে ভাগ্যান্বেষণে আগমন করে। নাটকীয় ভঙ্গিতে সে গ্রামে ঢুকেই গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে সমবেত মানুষদের তিরস্কার করে এই বলে যে, "আপনারা জাহেল বে-এলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন।" সে আরো জানায় যে, পীরের স্বপ্নাদেশে মাজার তদারকির জন্য তার এ গ্রামে আগমন। তার তিরস্কার স্বপ্নাদেশের বিবরণ শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে এবং শ্রদ্ধায় এমনভাবে বিচলিত হয় যে তার প্রতিটি হুকুম তারা সাগ্রহে পালন করে। গ্রামপ্রান্তের বাঁশঝাড় সংলগ্ন পরিত্যক্ত নাম না-জানা ব্যক্তির কবরটি দ্রুত পরিচ্ছন্ন করা হয়। ঝালরওয়ালা লালসালুতে ঢেকে দেওয়া হয় কবরটিকে। তারপর আর পিছু ফেরার অবকাশ থাকে না। কবরটি অচিরেই মাজারে এবং মজিদের জীবিকা ও শক্তির উৎসে পরিণত হয়। যথারীতি সেখানে আগরবাতি মোমবাতি জ্বলে, ভক্ত আর কৃপাপ্রার্থীরা সেখানে টাকা-পয়সা দিতে থাকে প্রতিদিন। ধীরে ধীরে ঘর-বাড়ি, জমিজমা, বিয়ে-শাদি, ধনসম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি সবই মজিদ অর্জন করে এ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কবর তথা মাজারকে কেন্দ্র করেই। সে এখন উড়ে চলা পাতা নয়, শেকড়গাড়া বৃক্ষ। ভণ্ডামির মাধ্যমে মজিদের যে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জন তার সূত্রপাত হয়েছিল মূলত নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম থেকেই। মজিদের স্বগত সংলাপ ও লেখকের বর্ণনা থেকেও অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে–

"তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে কুচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না তা নয়। কিন্তু তারও বাঁচবার অধিকার আছে- সেই কথাটাই সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে,

PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্যে অন্ধ। তার ভুল-ভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবে। তাঁর করুণা সীমাহীন।"

কবর ব্যবসা তথা মাজারকেন্দ্রিক ধর্মব্যবসায়ীদের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা এদেশের গ্রামাঞ্চলে বহুকাল ধরে বিদ্যমান। তাই মজিদ একটি টাইপ চরিত্র। গ্রামীণ কুসংস্কার, শঠতা, প্রতারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক সে। প্রচলিত বিশ্বাসের কাঠামো ও প্রথাবদ্ধ জীবনধারাকে সে টিকিয়ে রাখতে চায়। ওই জীবনধারায় সে প্রভু হতে চায়, চায় অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে। আর এজন্য সে যেকোনো কাজ করতে প্রস্তুত, তা যতই নীতিহীন বা অমানবিক হোক। একান্ত পারিবারিক ঘটনার রেশ ধরে সে প্রথমেই তাহেরের বৃদ্ধ বাবাকে এমন এক বিপাকে ফেলে মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের মনে প্রশ্ন জাগলেও সে-প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে খই পায় না। যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া-না-হওয়া বা খেতে পাওয়া না পাওয়া সবই মাজার তথা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা গ্রামের মানুষের স্মৃতিতে জাগ্রত হয়ে থাকে তা হলো তাহারের বাপের অপরাধবোধ, পাপের জ্বালায় ছটফটানি, তারপর তার কান্না। পাশের গ্রাম আওয়ালপুরে এক পীরের আগমন ঘটলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় সে। পীরসাহেবকে মোকাবিলা করতে মজিদ একদিন আওয়ালপুরে যায়। গিয়ে দেখে পীরের মাহফিলে হাজারো লোকের জমায়েত, তারা আজ আর তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে। নামাজের সময় হয়েছে- এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে জোহরের নামাজ শুরু করলে- মজিদ ভিড়ের মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে ওঠে 'যত সব শয়তানি বেদাতি কাজ কারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা... এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের নামাজের সময় জোহরের নামাজ পড়ার।' তখন পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা মজিদকে বলে, পীরসাহেব সূর্যকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন এবং তাঁর হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। আরেকজন আরো ব্যাখ্যা করে বলে, যেহেতু ভাদ্র মাস থেকে ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায় সেহেতু দু'কদমের উপর দুই লাঠি হিসাব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে। দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দু লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না তখন তারা বলল, যখন তর্ক শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল। শুনে মজিদ কুৎসিতভাবে মুখ বিকৃত করে বললে– 'কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারল না সুরুযটারে? এভাবে পীর সাহেবকে নাস্তানাবুদ করে শেষ পর্যন্ত পশ্চাৎসরণ করতে বাধ্য করে।

মজিদ নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ একটি চরিত্র। গ্রামের মাতব্বর খালেক ব্যাপারীর বড় স্ত্রী নিঃসন্তান আমেনা বেগম সন্তান কামনার আশায় আওয়ালপুরে পীর সাহেবের নিকট পানিপড়া আনতে দিলে মজিদ জানতে পেরে তাকে ভর্ৎসনা ও উপেক্ষা করার অজুহাতে তার ওপর চরম প্রতিশোধ নেয়। মজিদ খালেক ব্যাপারীকে তার স্ত্রীর পেটে বেড়িপড়ার অভিনব এক তত্ত্বের কথা বলে এবং মাজারে গিয়ে রোজা থেকে মাজারের চারপাশে সাত পাক ঘুরতে বলে। রোজা থেকে দুর্বল অবস্থায় ও অত্যন্ত মানসিক বিপর্যয়ে আমেনা বেগম সাত পাক দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে তার প্রতি দুশ্চরিত্রের অভিযোগ এনে খালেক ব্যাপারীকে বাধ্য করে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। এভাবেই সে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নেয়।

মজিদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সে ভালো করেই জানে যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে গ্রামের সাধারণ মানুষ মাজার ও তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। তাই সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াই আক্কাস নামের এক নবীন যুবকের স্থূল প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। এভাবেই মজিদ অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এক একটি ঘটনা ঘটিয়ে মহব্বতনগর গ্রামে তার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাকে নিরঙ্কুশ করে তোলে। তরুণ যুবক আক্কাস আলীকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করে মজিদ বলে, তোমার দাড়ি কই মিঞা?

মহব্বতনগরে মজিদ তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করলেও তার একক প্রতিষ্ঠাও আধিপত্যের ওপর আঘাত আসতে পারে এমন বিষয়ে সে অত্যন্ত সজাগ। সে জানে, স্বাভাবিক প্রাণধর্মই তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং শোষণের অদৃশ্য বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। ফলে ফসল ওঠার সময় যখন গ্রামবাসীরা আনন্দে গান গেয়ে ওঠে তখন সেই গান তাকে বিচলিত করে। ঐ গান বন্ধ করার জন্য সে তৎপর হয়ে ওঠে। রহিমার স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য চলাফেরায় সে বাধা দেয়। মজিদ বলে, অমন করে হাঁটতে নাই বিবি মাটি- এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা।

এসবই সে করে, মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও নিজের জাগতিক প্রতিষ্ঠার ভিতটিকে আরো মজবুত করার জন্য- এ সবই আসলে তার হিসেবি বুদ্ধির কাজ। সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তার বিশ্বাস সুদৃঢ় কিন্তু প্রতারণা বা ভণ্ডামির মাধ্যমে যেভাবেই হোক সে তার মাজার টিকিয়ে রাখতে চায়। এরপরও মাঝে মাঝে মজিদের মধ্যে হতাশা ভর করে। মজিদ কখনো কখনো মানুষের অনাস্থা অবলোকন করে নিজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একেকবার আত্মঘাতী হওয়ার কথাও ভাবে। তখন সে মাজার প্রতিষ্ঠায় যেসব কূট-কৌশল অবলম্বন করেছে, তার সবকিছু ফাঁস করে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবে। লেখকের ভাষায় "ঝালর-দেওয়া সালু কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলে দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন।"

মজিদ চরিত্রটি স্বার্থপরতা, প্রতিপত্তি আর শোষণের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের পর নিঃসন্তান জীবনে সে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একপ্রকার শূন্যতা অনুভব করে। এ শূন্যতা পূরণের অভিপ্রায়ে অল্পবয়সী এক মেয়েকে বিয়ে করে সে। প্রথম স্ত্রী রহিমার চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠান্ডা ভীতু মানুষ। মজিদের প্রতি তার সম্মান ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে। মজিদের প্রতি তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়। তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি। কিন্তু রহিমার মতো দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা ধর্মের ভয়ে ভীতু নয়। এমনকি মাজারের প্রতি বিশ্বাস তথা মাজারভীতি কিংবা মাজারের অধিকর্তা মজিদ সম্পর্কেও তার মধ্যে কোনো ভীতি বা ভয় কাজ করে না। তারুণ্যের স্বভাব অনুযায়ী তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা ও উচ্ছলতাই দৃশ্যমান হয়- সে যেন মজিদের সকল ভণ্ডামি ও শঠতার জীবন্ত বিগ্রহ রূপেই উপন্যাসে মূর্তিমান। মজিদ তাকে ধর্মভীতি দিয়ে আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ জমিলা তার মুখে থুথু দিলে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়। ঝড়ের মধ্যে সারা রাত তাকে মাজার ঘরে বেঁধে রাখে। এসময় মজিদের মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র না হয়ে তার ক্ষমতাবান সত্তাটি নিষ্ঠুর শাসনের মধ্যেই পরিতৃপ্তি খোঁজে। রহিমার পুনঃপুন অনুরোধে মজিদ ভোরে যখন জমিলা মৃতপ্রায় অজ্ঞান দেহটিকে ঘরে নিয়ে আসে তখন রহিমার জমিলাকে পরম মমতা ও মাতৃস্নেহে শুশ্রূষা করা দৃশ্যটি-মজিদের হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। মজিদের মনে হয়, মুহূর্তের মধ্যে যেন কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যে ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মাঝে মানবিক নবজন্মের উন্মেষ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত সে পূর্ববত্তাতেই ফিরে যায়। ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? এই মানবিক উক্তি মজিদকে ক্ষণিকের জন্য মানবতাবোধে জাগ্রত করলে মজিদ শেষ পর্যন্তও থেকে যায় জীবনবিরোধী শোষক ও প্রতারকের ভূমিকায়। তাই তো উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া ধানক্ষেত দেখে বিভ্রান্ত দিশেহারা কৃষকদের হাহাকার শুনে মজিদকে কঠোর ভাষায় বলতে দেখি– "নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখ।"

এভাবে মজিদ চরিত্র বিশ্লেষণের উপান্তে এসে বলা যায় মজিদ একটি নিঃসঙ্গ চরিত্র। উপন্যাসেও লেখক একাধিকবার মজিদের অস্তিত্বসংকট ও নৈঃসঙ্গবোধের কথা বলেছেন। তার কোনো আপনজন নেই, যার সঙ্গে সে তার মনের একান্তভাব বিনিময় করতে পারে। তার সঙ্গে সকলেরই সম্পর্ক কেবল বাইরের- কখনো প্রভাব বিস্তারের, কখনো বা নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব আরোপের, কখনোই অন্তরের বা আবেগের নয়। মজিদ নিজেও কখনো আবেগী হতে পারে না। কারণ সে জানে আন্তরিকতা ও আবেগময়তা তার পতনের সূচনা করবে যাতে ধসে পড়তে পারে তার তিল তিল করে গড়ে তোলা মিথ্যার সাম্রাজ্য। তাই সে কখনোই আবেগকে প্রশ্রয় দেয়নি। এসব সত্ত্বেও সে যে আসলেই দুর্বল ও নিঃসঙ্গ- এ সত্যটি ধরা পড়ে স্ত্রী রহিমার কাছে। ঝড়ের রাতে জমিলাকে শাসনে ব্যর্থ হয়ে মজিদ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কীভাবে তরুণীবধূ জমিলাকে সে নিয়ন্ত্রণ রাখবে সেই চিন্তায় মজিদ একেবারে যেন দিশেহারা বোধ করে। এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যেই জীবনে প্রথম মজিদের মধ্যে আত্মপরাভবের সৃষ্টি হয়। সে রহিমাকে তার দীনতা স্বীকার করে বলে: 'কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও?' ওই ঘটনাতেই রহিমা বুঝতে পারে তার স্বামীর দুর্বলতা কোথায় এবং তখন ভয়, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির মানুষটি তার কাছে পরিণত হয় করুণার পাত্রে। তাই মজিদ চরিত্রটি একটি ভণ্ড ও প্রতারকের চরিত্র হয়েও বাংলা সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল ও বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাময় চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে নিঃসন্দেহে।

০২. খালেক ব্যাপারী

খালেক ব্যাপারী 'লালসালু' উপন্যাসের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। সেও সমাজের টাইপ চরিত্র। ভূস্বামী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ায় তাঁর কাঁধেই মহব্বতনগরের সামাজিক নেতৃত্বের ভার পড়ে। উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম বিচার-সালিশসহ এমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই যেখানে তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। সমাজের নেতা হওয়ায় নিরাকপড়া এক দুপুরে গ্রামে আগত ভণ্ড মজিদ তার বাড়িতেই আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে সমাজে মজিদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও এমনকি প্রিয় স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করলেও মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর পরস্পর সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি কখনোই বরং তারা পরস্পর বজায় রেখেছে তাদের অলিখিত যোগসাজশ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...নির্মম তাই। কু-স্বামী ও তথাকথিত ধর্মীয় নেতা মোল্লা-পুরোহিতের প্রয়োজনে অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠে নিবিড় সখ্য। কারণ দু'দলের ভূমিকাই (এরা সমাজের শোষকশ্রেণি)। এরা দুজনেই জানে, "অজ্ঞানে অশিক্ষায় ও ... উলটা পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেকজনের ... প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।" ... শোষকশ্রেণির অপকর্মের চিরসাথি ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা সম্মিলিত ... জিইয়ে রাখে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও অন্ধকার। শিক্ষার আলো, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ... সৃষ্টির পথে তৈরি করে পাহাড়সম বাধা। যাতে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত ... মানবচেতনা থেকে। এরই ফলে চিরকালীন আধিপত্য বজায় রাখতে ... শোষকশ্রেণি। শুধু কুস্বামী শোষক নয়, যেকোনো ধরনের শোষকের ক্ষেত্রে এ ... তার শোষণের স্বার্থে ধর্মব্যবসায়ীদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। এ কারণেই ... সকল কর্মকাণ্ডে নিঃশর্ত সমর্থন জানিয়েছে খালেক ব্যাপারী। এমনকি মজিদের ... মেনে নিয়েছে অবনত মস্তকে- কোনো প্রতিবাদ বা বিরোধ করেনি ... এমনকি তার প্রথম স্ত্রী তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তার খারাপ লাগলেও ... সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে অকাতর চিত্তে।

... উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খালেক ব্যাপারীর উপস্থিতি থাকলেও সে ... ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। এটি চরিত্রটির অন্যতম ... আমরা জানি, ধর্মব্যবসায়ীরা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হিসেবে নিজেদের ... সাধারণ মানুষের ওপরে প্রভুত্ব করে। ফলে সমাজের শোষকরাও তাদের ... হয়। কিন্তু শোষকশ্রেণির হাতে যেহেতু অর্থের লাগাম থাকে তাই তারা ... নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু 'লালসালু' উপন্যাসে খালেক ব্যাপারীর চরিত্রে ... কখনোই লক্ষ করি না। বরং সকল ক্ষেত্রেই সে মজিদের কথার সুরে ... আচার বিচার সর্বক্ষেত্রে মজিদের কথার উপরে সে কখনো কথা ... মজিদের সঙ্গে তার কখনো দ্বন্দ্ব বাধেনি। তার অর্থের শক্তি সবসময় ... অধীনতা স্বীকার করেছে। তার এ দুর্বলতা গতানুগতিক টাইপ চরিত্রের ... ধারা থেকেও ব্যতিক্রমী।

০৩. রহিমা

... প্রথম স্ত্রী রহিমা 'লালসালু' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। এটি একটি ... চরিত্র। সে শুধু মজিদের স্ত্রী নয়, তার সকল কর্মকাণ্ডের একনিষ্ঠ সহায়ক ও ... লম্বা-চওড়া শারীরিক শক্তিসম্পন্ন এই নারী পুরো উপন্যাস জুড়ে স্বামীর ... কাছে অসহায় হয়ে থাকলেও তার চরিত্রের একটি স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে। সৈয়দ ... নিজেই তার শক্তিমত্তাকে বাইরের খোলস বলেছেন, তাকে ঠান্ডা ভীতু ... পরিচয় দিয়েছেন, "তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ বাইরের খোলস মাত্র। ... ঠান্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার ... ও ভয় অটুট।"

... ভীতি-বিহ্বল নরম কোমল শান্ত রূপের পেছনে সক্রিয় রয়েছে ঈশ্বর-বিশ্বাস ... মাজারের প্রতিনিধি হিসেবে স্বামী মজিদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও ভক্তি। ধর্মভীরু ... ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের কারণে যে কোমল স্বভাবসম্পন্ন হয়, রহিমা তারই ... উদাহরণ। সমগ্র মহব্বতনগর গ্রামের সাধারণ সরল ধর্মভীরু মানুষেরই সে ... প্রতিনিধি। স্বামীর অলৌকিক ক্ষমতা বা মাজারের সত্যতা সম্পর্কে তার মনে ... প্রশ্নের উদয় হয় না। সে সর্বদাই নির্দ্বিধায় মেনে নেয় মজিদের মুখ থেকে ... ধর্মের সকল বিধান। মাজার সংক্রান্ত সকল কাজকর্মের পবিত্রতা রক্ষা এবং ... সকল গার্হস্থ্য কর্ম প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই সে একান্তভাবে সৎ এবং নিয়মনিষ্ঠ। ... বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে তুলে নিয়ে ... গরুর দামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়ালঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। ... মাটিতে আওয়াজ হয়। কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা। রহিমা ... হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে তারপর বলে, "অমন করি হাঁটতে নাই ... মাটি-এ গোস্বা করে। মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা। শুনে রহিমার চোখে ... আগেও এ কথা শুনেছে রহিমা। মুরব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা ... মজিদের কথার বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।"

... নিয়ে রহিমার যেমন আছে ভীতি ও ভক্তি তেমনি এ মাজারের প্রতিনিধির স্ত্রী ... রয়েছে তার গর্ব ও মর্যাদাবোধ। আর এ বোধ থেকেই সে গ্রামের মাজার ও ... প্রতিনিধি সম্পর্কে গুণকীর্তন করে, তার শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা ... এবং এভাবে সে নিজেকেও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। হাসুনির মায়ের সমস্যা ... স্বামীর কাছে জানায় কিংবা আমেনা বিবির সংকট মুহূর্তে তার পাশে গিয়ে ... তখন তার মধ্যে থাকে একটি সহানুভূতিশীল মন। রহিমার এ মনটি স্বামী ... তুলনায় একেবারেই বিপরীতমুখী।

মজিদের কর্তৃত্বপরায়ণতা, মানুষের ধর্মভীরুতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রয়োজনের [illegible] বিপরীতে রহিমার মধ্যে সক্রিয় থাকে কোমল হৃদয়ের এক মাতৃময়ী সত্তা। লেখকের বর্ণনায়, "কোনোদিন রহিমা সারা গ্রামবাসীর জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার [illegible] শান্তি পাও। কোনোদিন যা [illegible] দু-দিন আগে যে [illegible] রহমত কর। [illegible] নদীতে [illegible] তাদের কথা স্মরণ করে বলে, [illegible] নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।" রহিমার মাতৃময়ী নারী হৃদয়ের মমতা জমিলা প্রসঙ্গে আরো বেশি লক্ষ করা যায়। তাদের সন্তানহীন দাম্পত্য-জীবনে মজিদ যখন দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তাব করে তখন রহিমার মধ্যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয় না। এর মূলে সক্রিয় তার স্বামীর প্রতি অটল ভক্তি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এবং সরল ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু জমিলা যখন তার সতীন হিসেবে সংসারে আসে তখনও সামাজিক গার্হস্থ্য বাস্তবতার কারণে যেটুকু ঈর্ষা সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল তাও অনুপস্থিত থাকে তার ওই [illegible] সংবেদী মাতৃহৃদয়ের কারণে। জমিলা তার কাছে সপত্নী হিসেবে বিবেচিত না হয়ে তার মাতৃহৃদয়ের কাছে সন্তানতুল্য বলে বিবেচিত হয়। এ পর্যায়ে জমিলাকে কেন্দ্র করে তার মাতৃত্বের [illegible] পূর্ণতা অর্জন করে যখন মজিদ জমিলার প্রতি শাসনের খড়্গ তুলে ধরে।

স্বামীর সকল আদেশ নির্দেশ উপদেশ সে যেভাবে পালন করেছে সেভাবে জমিলাও পালন করুক প্রথমত রহিমা তা-ই চেয়েছিল কিন্তু সে-ব্যাপারে স্বামীর জোর জবরদস্তিকে সে পছন্দ করেনি। স্বামীর প্রতি তার দীর্ঘদিনের যে অটল ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এক্ষেত্রে তাতে ফাটল ধরে। এক্ষেত্রে তার ধর্মভীরুতা বা স্বামীভক্তিকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে নিপীড়িত নারীর প্রতি তার মাতৃহৃদয়ের সহানুভূতি। তাই যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মত, পর্বতের মতো অটল সেই রহিমাকে মজিদ যখন মাজারে বেঁধে রাখা জমিলা সম্পর্কে বলতে দেখি, "ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।" অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয়েছিল ব্যক্তিত্বহীন, একমাত্র আনুগত্যের মধ্যেই ছিল যার জীবনের সার্থকতা, সেই সহজ সরল সাধারণ নারীই উপন্যাসে শেষে এসে তার মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠে। রহিমা চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে এখানেই লেখকের সার্থকতা।

০৪. জমিলা

নিঃসন্তান মজিদের সন্তান-কামনাসূত্রে তার দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে উপন্যাসে জমিলার আগমন ঘটলেও ভণ্ডামি, শঠতা ও পীরবাদের জীবন্ত প্রতিবাদ ও ঘৃণার এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ হলো জমিলা চরিত্র। এ বিচারে জমিলাকেই উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের অভিধা দেওয়া যেতে পারে।

শুধু সন্তান-কামনাই মজিদের দ্বিতীয় বিয়ের একমাত্র কারণ ছিল কিনা, নাকি তরুণী স্ত্রীর প্রত্যাশাও তার মাঝে সক্রিয় ছিল তা লেখক স্পষ্ট করেননি। তবে উপন্যাসে লেখক বলেছেন-"কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখত প্রথম যৌবনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা।" অথবা "জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?" উপর্যুক্ত লেখকের বক্তব্য অবশ্য প্রমাণ করে মজিদের দ্বিতীয় বিয়ের পেছনে তার ভোগাকাঙ্ক্ষাও কাজ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে আমরা লক্ষ করি মজিদের গৃহে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে যার আগমন ঘটে সেই জমিলা ছিল তার কন্যার বয়সী এক দুরন্ত কিশোরী।

প্রথমে দেখে শান্ত মনে হলেও জমিলা চরিত্রে কৈশোরক চপলতাই প্রধান। বিয়ের আগে মজিদ খালেক ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু জমিলাকে প্রথম দেখে মজিদের বেড়ালছানার মতো নিরীহ বা রহিমার একরত্তি মাইয়া কিন্তু বড় ডালা, চোখ পর্যন্ত তোলে না-বলে মনে হলেও লেখকের বর্ণনায়-"তারা দুজনেই কিন্তু ভুল করে, কারণ দিন কয়েকের মধ্যেই জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে বসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে।" একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে জমিলার সোনালি সুন্দর হাসির ঝংকার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনেনি। আবার হঠাৎ একদিন এমনই জীবন্ত ঝরনার ধারার মতো হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে জমিলা রহিমাকে বলে, 'কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ'। আবার হঠাৎ হাসির একটা চমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে আর এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি। প্রথম দর্শনে স্বামীকে তার ভাবী শ্বশুর এবং সপত্নী রহিমাকে তার শাশুড়ি বলে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং বিয়ের পরও সেটা তার কাছে হাস্যকর বিষয় হয়ে থাকে ঐ কৈশোরক অনুভূতির কারণেই। তাছাড়া জমিলা স্বভাবেও চপল। আর এই

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

[illegible]

বৃষ্টি শুরু হয়। জোর বাতাস কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলে রহিমা মজিদকে অনুরোধ করে জমিলাকে ঘরে নিয়ে আসতে। রহিমার অনুরোধে মজিদ মাজারে গিয়ে দেখে লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে যে বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেওয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।

এ দৃশ্য যেন মজিদ ও তার কল্পিত মিথ্যা মাজারের প্রতি চরম ঘৃণা ও প্রতিবাদের বহুমাত্র প্রকাশ; ভণ্ডামি ও ধর্মব্যবসায়ের বিরুদ্ধে এক জীবন্ত বিদ্রোহ।

পরিশেষে বলা যায়, জমিলা চরিত্রের মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'লালসালু' উপন্যাসে একটি প্রচণ্ড প্রতিবাদী সত্তার উপস্থিতি ঘটিয়েছেন। মজিদের শাস্ত্রীয় ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের প্রাচীরে পুরো মহব্বতনগর গ্রামে যে প্রাণময়তা ছিল রুদ্ধ, জমিলার প্রাণখোলা হাসি সেখানে যেন এক মুক্তির সুবাতাস। রুদ্ধতার নায়ক যে মজিদ উপন্যাসে তার বিপরীতে প্রাণময় মুক্তির প্রতীক নায়িকা জমিলা। একদিকে সে নারী, অন্যদিকে সে স্বভাবে তরুণী প্রতিবাদী-এ দুইটিই তার প্রাণধর্মের এক প্রতীকী উদ্ভাসন। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে ধর্মব্যবসার বিস্তার ঘটেছে তার পেছনে পুরুষতন্ত্রও সক্রিয়। সুতরাং নির্জীব ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে সজীব প্রাণধর্মের জাগরণের ক্ষেত্রে জমিলাকেই যথাযথ আশ্রয় করা হয়েছে। জমিলা হয়ে উঠেছে নারীধর্ম, হৃদয়ধর্ম বা সজীবতারই এক যোগ্য প্রতিনিধি। আর এখানেই জমিলা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা।

০৫. অন্যান্য চরিত্র

'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ আলোচনায় আরো দুটি চরিত্রের প্রসঙ্গ অবতারণা না করলেই নয়। এ চরিত্র দুটি হলো তাহের-কাদের-হাসুনির মায়ের বাবা ও আক্কাস মিঞা। এ উপন্যাসে তাহের-কাদের-হাসুনির মায়ের পরিবারে তাদের পিতা-মাতার কলহ এবং এ কলহের বিচারকার্যের মধ্য দিয়ে তাহের-কাদেরের পিতার চরিত্রটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। উপন্যাসে এটিই একমাত্র চরিত্র যে মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণ করেছে; বিচারসভায় প্রদর্শন করেছে অনমনীয় দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব। তার নির্ভীক যুক্তিপূর্ণ ও উন্নতশির অবস্থান নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রমধর্মী। সে মজিদের বিচারের রায় অনুযায়ী নিজের মেয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে বটে কিন্তু তা মজিদের প্রতি শ্রদ্ধা বা আনুগত্য থেকে করেনি, মানবিক দায়িত্ববোধ থেকেই সে এ কাজ করেছে। আর এ ঘটনার পরপরই তার নিরুদ্দেশ গমনের ঘটনায় চরিত্রটির যেমন প্রবল ব্যক্তিত্বপরায়ণতা ও আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশিত হয়েছে তেমনি এ আচরণের মধ্য দিয়ে মজিদের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদও ব্যক্ত হয়েছে।

স্কুলে না পড়লে মুসলমানের পরিত্রাণ নাই। অর্থাৎ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাই কেবল পারে পশ্চাৎপদ, কুশিক্ষা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করতে। উনিশ শতকের এ সংস্কার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েই মহব্বতনগর গ্রামের মোদাব্বের মিঞার শিক্ষিত ছেলে আক্কাস মিঞা গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। কিন্তু সুচতুর মজিদ তার এ প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে সুকৌশলে গ্রামে একটি পাকা মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়ে গ্রামের মানুষের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করলেও আক্কাস মিঞার স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি ছিল, অন্ধকারে আলোকশিখা জ্বালানোর মতোই উপন্যাসে একটি আশাপ্রদ ঘটনা। তাই ব্যর্থ হলেও 'লালসালু' উপন্যাসে আক্কাস মিঞা একটি অন্যতম ব্যতিক্রমী চরিত্র। সর্বোপরি 'লালসালু' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কাহিনি গ্রন্থনায়, যথাযথ চরিত্রসৃষ্টিতে অসাধারণ দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

লিখিত অংশ

লিখিত অংশ — এক কথায় প্রশ্নোত্তর

প্র : [illegible]
উত্তর : [illegible]

প্র : [illegible]
উত্তর : [illegible]

প্র : [illegible]
উত্তর : [illegible]

প্র : [illegible]
উত্তর : [illegible]

প্র : [illegible]
উত্তর : [illegible]

প্র : [illegible]
উত্তর : [illegible]

প্র : [illegible]
উত্তর : [illegible]

প্র : দুদু মিঞার মুখে লজ্জার হাসি আসে কেন?
উত্তর : কলমা জানে না তাই।

প্র : মজিদের শক্তির মূল উৎস কী?
উত্তর : মাজার।

প্র : মজিদের সঙ্গে গ্রামবাসীর যোগসূত্রকারী চরিত্র হিসেবে কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?
উত্তর : রহিমা।

প্র : ঢেঁকি খুড়োর হাতে মার খেয়ে হাসুনির মা কার বাড়িতে গিয়েছিল?
উত্তর : মজিদের।

প্র : ঝড় এলে হাসুনির মায়ের কী করার অভ্যাস?
উত্তর : হৈ চৈ করা।

প্র : মজিদ হাসুনির মার কাছ থেকে কী চেয়েছিল?
উত্তর : তামাক।

প্র : মজিদ হাসুনির মাকে কী রঙের শাড়ি কিনে দিয়েছিল?
উত্তর : বেগুনি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

[illegible] মাজারে লোকজনের আসা কমে যায় কেন?
উত্তর : [illegible] পিরদের আধিপত্যে।
[illegible] হঠাৎ নড়ে'। এখানে 'পাথর' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : মজিদকে।
[illegible] বিবি তার স্বামীকে পানিপড়া আনতে বলেছিল কেন?
উত্তর : [illegible] হওয়ার আশায়।
[illegible] সমাজ ব্যবস্থার কোন অসঙ্গতির শিকার?
উত্তর : বাল্যবিবাহ।
[illegible] জমিলাকে কী বলে সম্বোধন করে?
উত্তর : বোন।
[illegible] শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : পুকুর।
[illegible] পাটি বুনতে বুনতে কেঁদে উঠেছিল কেন?
উত্তর : রহিমার গম্ভীর মুখ দেখে।
[illegible] অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাজারে খ্যাংটা বুড়ি নালিশ করেছিল কেন?
উত্তর : ছেলের মৃত্যুতে।
[illegible] উপন্যাসে কোন পাড়ার উৎসবের কথা বর্ণিত আছে?
উত্তর : ঝোপপাড়া।
[illegible] বিলাপ শুনে জমিলার মন খারাপ হয়েছিল?
উত্তর : খ্যাংটা বুড়ির।
[illegible] উপন্যাসে জমিলার কোন পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর : হৃদয়হীনচেতা।
[illegible] বাড়িতে জিকিরের জন্য যে শিরনি রান্না চলছিল তার তদারকির দায়িত্ব ছিল কার?
উত্তর : রহিমা ও জমিলার।
[illegible] করতে করতে কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল?
উত্তর : মজিদ।
[illegible] নামাজ পড়ে মজিদ মাজারে কীসের আওয়াজ শুনেছিল বলে প্রকাশ করে?
উত্তর : শিংহের।
[illegible] মুখে থুথু ফেলেছিল কে?
উত্তর : জমিলা।
[illegible] উপন্যাসে চৌকাঠে বসলে ঘরে কী আসে বলে উল্লেখ রয়েছে?
উত্তর : বলা।
[illegible] দেখে মজিদের মনে সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য?
উত্তর : আমেনা বিবির।
[illegible] মনের যন্ত্রণা সহ্য করার মতো দুর্বল নয়?
উত্তর : মেয়েলোকের।
[illegible] বিবি কত বছর বয়সে খালেক ব্যাপারীর সংসারে এসেছিল?
উত্তর : ১৩ বছর বয়সে।
[illegible] ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।' ওটা কী?
উত্তর : মোতাবুদ্দির তালগাছ।
[illegible] দেখে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে?
উত্তর : বাদলের বিবর্ণ অংশ।
[illegible] উপন্যাসে কে বহুদিন বিদেশে ছিল?
উত্তর : মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস।
[illegible] কণ্ঠে মজিদ হাহাকার করে ওঠে কেন?
উত্তর : নিঃসন্তান বলে।
[illegible] বুড়ি মাজারে এসে মজিদের দিকে কত পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল?
উত্তর : পাঁচ আনা পয়সা।
[illegible] গ্রামে মসজিদ নির্মাণে তদারকিতে কে ছিল?
উত্তর : মজিদ।
[illegible] চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে' কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে?
উত্তর : জমিলা।
'তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। এখানে 'জাহেল' শব্দের অর্থ?
উত্তর : মূর্খ বা নির্বোধ।
[illegible] এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে।' মজিদের এ প্রতিদ্বন্দ্বীটি কে?
উত্তর : জমিলা।

প্র : কার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়
উত্তর : রহিমার।

প্র : মজিদের মতে মাজারে শুয়ে থাকা ব্যক্তির নাম কী?
উত্তর : মোদাচ্ছের।

প্র : 'মোদাচ্ছের' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : কাপড়ে ঢাকা মানুষ, অজ্ঞাতনামা।

প্র : জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে কেন?
উত্তর : ক্রোধে।

প্র : 'মজিদ সত্যি বজ্রাহত হয়েছে।' কেন?
উত্তর : জমিলার থুথু নিক্ষেপের ঘটনায়।

প্র : ঝড়ের রাতে সুবেহ সাদেকের সময় মজিদের কণ্ঠে কোন সুরা গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে?
উত্তর : সূরা আল-ফালাক।

প্র : 'ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে লুফে খেত খোদার ঢিল।' এখানে 'খোদার ঢিল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : শিলাবৃষ্টিকে।

প্র : 'প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে।' কার প্রশ্ন শুনে মজিদের হুঙ্কার ছাড়ার ইচ্ছা হয়?
উত্তর : রহিমার।

প্র : জমিলাকে দেখে রহিমার মধ্যে কী জেগে উঠেছিল?
উত্তর : মাতৃস্নেহ।

প্র : রহিমার পেটে কত প্যাঁচের বেড়ি রয়েছে?
উত্তর : চৌদ্দ।

প্র : আমেনাকে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দেয় কে?
উত্তর : মজিদ।

প্র : আক্কাস কোথায় কাজ করত?
উত্তর : পাটের আড়তে।

প্র : 'নিরাক' শব্দের অর্থ হচ্ছে
উত্তর : স্তব্ধতা।

প্র : কোন মাসের রাতে রহিমা ধান সিদ্ধ করছিল?
উত্তর : পৌষ।

প্র : বয়স হলেও কার মধ্যে আনাড়িপনা ভাব রয়েছে?
উত্তর : হাসুনির মা।

প্র : তানু বিবির ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো চমকে ওঠে কে?
উত্তর : আমেনা।

প্র : মজিদের প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হয়েছে কে?
উত্তর : আমেনা বিবি।

প্র : 'আমার দয়ার শরীল' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : মজিদের।

প্র : রেলগাড়ির কীসের কাঁটা নড়ে না?
উত্তর : ধৈর্যের কাঁটা।

প্র : গ্রামবাসীর অন্তর কীসে জর্জরিত হয়ে ওঠে?
উত্তর : অনুশোচনায়।

প্র : কাদের আর তাহের কীভাবে লোকটিকে চেয়ে দেখে?
উত্তর : অবাক দৃষ্টিতে।

প্র : 'পুলক' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : আনন্দ।

প্র : সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ কে?
উত্তর : মজিদ।

প্র : মজিদের যশ, খ্যাতির উৎস কী?
উত্তর : পুরনো কবরটি।

প্র : মজিদের নিঃসঙ্গবোধের কারণ কী?
উত্তর : নিঃসন্তান হওয়ায়।

প্র : রহিমা কাকে পোষ্য রাখতে চায়?
উত্তর : হাসুনিকে।

প্র : 'তোমার একটা সাথি আনুম?' এখানে 'সাথি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : সতিন।

প্র : মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল কোন মাসে?
উত্তর : জৈষ্ঠ।

প্র : রহিমা জমিলাকে হাসি থামাতে বলে কেন?
উত্তর : মজিদের ভয়ে।

প্র : 'আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ'-এখানে 'তানি' কে?
উত্তর : মজিদ।

প্র : পশ্চিম আকাশে শুকতারা কখন জ্বলে?
উত্তর : শেষরাতে।

প্র : হাসপাতাল কোথায়?
উত্তর : করিমগঞ্জ।

প্র : 'ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে, বাইরে যত ঠান্ডা থাকুক না কেন?' কার ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে?
উত্তর : মজিদের।

প্র : মজিদের বাড়িতে প্রথম এসে জমিলা রহিমাকে কী ভেবেছিল?
উত্তর : শাশুড়ি।

প্র : 'নামহীন জনবহুল এ অঞ্চল' কোন অঞ্চল?
উত্তর : নোয়াখালী।

প্র : মজিদ জমিলাকে কোথায় বেঁধে রেখেছিল?
উত্তর : মাজারে।

প্র : মজিদের মতে দুনিয়ার মানুষের মতো কারা তাকে ভয় পায়?
উত্তর : জিন-পরীরা।

প্র : 'ও যেন ঘোর পাপী।' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : তাহেরের বাপ।

প্র : মহব্বতনগর গ্রামে কে শিকড় গেড়েছে?
উত্তর : মজিদ।

প্র : আওয়ালপুরের পির কোথায় বাস করে?
উত্তর : ময়মনসিংহে।

প্র : গ্রামের লোকেরা কী চেনে?
উত্তর : জমি আর ধান।

প্র : আমেনা বিবি কী বারে রোজা রাখে?
উত্তর : শুক্র।

প্র : এককালে কে উড়ুনি মেয়ে ছিল?
উত্তর : বুড়ি।

প্র : ধলা মিয়া মজিদের কাছে গিয়েছিল কেন?
উত্তর : পানিপড়া আনতে।

প্র : মজিদ কখন মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে?
উত্তর : শ্রাবণের দুপুরে।

প্র : মাজারের অনাবৃত কোণটা দেখে মজিদের কোন কথা স্মরণ হয়?
উত্তর : মৃত্যুর।

প্র : গ্রামবাসীর অন্তর খাঁ খাঁ করে কেন?
উত্তর : মাটির তৃষ্ণায়।

প্র : দুদু মিঞার কয় ছেলে?
উত্তর : সাত।

প্র : 'ষোলশহর' কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : চট্টগ্রাম।

প্র : 'লালসালু' কোন ধরনের উপন্যাস?
উত্তর : সামাজিক ।

প্র : 'কলমা জানস না ব্যাটা?' কার উক্তি?
উত্তর : খালেক ব্যাপারীর।

প্র : মতলুব খাঁ কে?
উত্তর : ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

প্র : বুড়ি কেমনভাবে আল্লা, আল্লা বলে?
উত্তর : শিশুর মতো।

প্র : কার দেহ ভরা ধানের গন্ধ?
উত্তর : রহিমার।

প্র : মহব্বতনগর গ্রামের মাতব্বরের নাম কী ছিল?
উত্তর : রেহান আলি।

লিখিত অংশ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. 'লালসালু'কে কেন সামাজিক উপন্যাস বলা হয়? [ঢাবি গ ১৯-২০]

উত্তর : উপন্যাস আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'। এটি একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। এ উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ সমাজ; বিষয় যুগ যুগ ধরে শেকড়গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী মজিদ কীভাবে প্রতারণার জাল বিস্তার করে সেটি-ই শিল্পরূপ পেয়েছে 'লালসালু' উপন্যাসে।

শ্রাবণের নিরাক পড়া মধ্যাহ্নে মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের নাটকীয় প্রবেশের মধ্যেই রয়েছে তার ভণ্ডামি ও প্রতারণার পরিচয়। অলৌকিকতার অবতারণা করে মজিদ জানায় যে, মোদাচ্ছের পিরের স্বপ্নাদেশে মাজার তদারকির জন্য এ গ্রামে সে আগমন করেছে। তার ভিত্তিহীন ও স্বপ্নাদেশের কথা শুনে সহজ-সরল গ্রামবাসী বিগলিত হয়ে তার হুকুম পালন করে। শস্যহীন অঞ্চলে বেড়ে ওঠা মজিদ ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এমন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ধর্ম ব্যবসায়ীদের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা এদেশের গ্রামাঞ্চলে বহুদিন ধরে বিদ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গ্রামীণ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এ উপন্যাসে যথাযথভাবেই তুলে ধরেছেন।

মাজারের আয় নিয়ে মজিদ কিছুদিনের মধ্যেই মহব্বতনগর গ্রামে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। পাশাপাশি সমাজেরও কর্তাব্যক্তি হয়ে ওঠেন। এ ক্ষেত্রে মাতব্বর খালেক ব্যাপারীই তার সহায়ক শক্তি। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর পারিবারিক জীবনেও নাক গলাতে থাকে সে। আমেনা চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে খালেক ব্যাপারীকে দিয়ে তাকে তালাক দিতে বাধ্য করে।

গ্রামবাসী যাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে মজিদের মাজারকেন্দ্রিক পশ্চাৎপদ জীবনধারা থেকে সরে যেতে না পারে, সে জন্য সে শিক্ষিত যুবক আক্কাসের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। মজিদ এমনই কূট-কৌশল প্রয়োগ করে যে আক্কাস গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক গ্রাম, সমাজ ও মানুষের বাস্তব-চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আর উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে একটি শিল্পিত সামাজিক দলিল। তাই 'লালসালু'কে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়।

০২. 'লালসালু' উপন্যাস আমাদের কী শিক্ষা দেয়? দশ বাক্যে লেখ। [শে হা বি ১৮-১৯]

উত্তর : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসের জীবন বাস্তবতা আমাদের জীবনের নানাদিক শিক্ষা দেয়। ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে দেশের মানুষের সুসংগত ও স্বতস্ফূর্ত বিকাশের অন্তরায়গুলিকে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন কুসংস্কারের শক্তি আর অন্ধবিশ্বাসের দাপট। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও সমাজ সরল-ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও ভীতির মধ্যে রেখে শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে।

ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল- সমাজ-বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে সমাজ থেকে ধর্ম ব্যবসা, ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব দূর করা। আর এসব অনাচার দূর করার একমাত্র হাতিয়ার আধুনিক শিক্ষা। মজিদ জানত যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হলে তার অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। তাই সে কৌশলে আক্কাসকে গ্রাম ছাড়া করে। আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সমাজ থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামি দূর হবে। এছাড়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি অনেক কমে যাবে। নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম হবে। সবাই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে বিধায় সমাজে প্রচলিত নানাবিধ শোষণের পরিমাণ কমে যাবে।

০৩. জমিলা মজিদের মুখে থুথু দিয়েছিল কেন?

উত্তর : মজিদের শাসনে ভয়ে কাঁপতে থাকা জমিলা ক্রোধে মজিদের মুখে থুথু দিয়েছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জমিলাকে প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমার সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘরে আনে অল্প বয়সী মেয়ে জমিলাকে। গ্রামের মানুষ মজিদকে ভয় পেলেও জমিলা ভয় পায় না। তাই মজিদ জমিলার মনে ভয় সৃষ্টির জন্য তাকে মাজারে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু জমিলা তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মজিদের কঠিন হাত থেকে ছোটার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এতে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। একপর্যায়ে ধর্ম ব্যবসায়ী মজিদের মুখে থুথু মেরে তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণার বিষয়টি জানিয়ে দেয় সে।

CamScanner

'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।' উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শিলাবৃষ্টিতে মাঠের সব ধান নষ্ট হয়ে গেলে সবার মতো মজিদও শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে কিন্তু কোনো কথা বলতে পারে না; তার ভাবলেশহীন দৃষ্টি প্রসঙ্গে লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা শুরু হলে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়, তা দেখে মজিদের মনে অস্থিরতা দেখা দেয়। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হলে মজিদের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। কারণ ধান না হলে মাজার শূন্য হবে, মাজারের ফসলেই মজিদের সংসার চলে। চারদিকে মজিদ বিপদের ছায়া দেখে চমকে যায়, মাঠে গিয়ে ঝরে পড়া ধান দেখে বিস্মিত হয়। সে ভাষা হারিয়ে ফেলে, পাথরে খোদাই করা চোখের মতো সে শুধু চেয়ে থাকে।

গ্রামের মানুষ যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ।' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : রহিমা যেমন মজিদের অনুশাসন মেনে চলে, গ্রামের লোকেরা তেমনি মজিদের সব শাসন-অনুশাসন মেনে চলে- একথা বোঝাতেই লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা মজিদের ধর্ম ও অনুশাসনকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে। মজিদের মনগড়া ধর্মের ছকেই গ্রামবাসীর জীবন চলে। মজিদের প্রথম স্ত্রী রহিমাও মজিদের কখনো কোনো বরখেলাপ করে না। এদিক থেকে গ্রামের লোকেরা আজ রহিমার অন্য সংস্করণ হয়ে উঠেছে। কারণ, রহিমার মতো তারাও প্রতিবাদহীন, নির্বিকার।

'দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতালার কালাম জাল হয় না' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ভাগ্যের লিখন লেখেন আল্লাহ, তাঁর লিখন বদলানোর ক্ষমতা কারো নেই।

আওয়ালপুরে এক নতুন পিরের আগমন ঘটেছে। মৃত মানুষকে জীবিত করার ক্ষমতা রয়েছে তিনি। খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী আমেনা নিঃসন্তান। সন্তান লাভের আশায় সে ওই পিরের পানি পড়া খেতে চায়। তাই মজিদ আলোচ্য উক্তিটি করে। মূলত আওয়ালপুরের পিরের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব থাকায় মজিদ এ কথা বলেছে।

'সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে মহব্বতনগর গ্রামের দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি মজিদ ও খালেক ব্যাপারী সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'লালসালু' উপন্যাসের দুই ক্ষমতাধর মানুষ মজিদ আর খালেক ব্যাপারী। খালেক ব্যাপারী বিস্তর জমিজমার মালিক এবং সে গ্রামের মাতবরও। অন্যদিকে মজিদ হলো মাজারের খাদেম। মজিদের যেমন খালেক ব্যাপারীকে প্রয়োজন, ঠিক তেমনি খালেক ব্যাপারীরও মজিদকে প্রয়োজন। অলৌকিক শক্তিধর মজিদ, যাকে গ্রামবাসী শ্রদ্ধা, ভয় ও ভক্তি করে। তাই মজিদকে খালেক ব্যাপারী হটায় না। আর এজন্যই মজিদ ও খালেক ব্যাপারী একই পথের পথিক। তাদের দুজনের লক্ষ্যও এক।

'যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আওয়ালপুরে জাঁদরেল পিরের আগমনে মজিদের প্রভাব কমে যাওয়ার বিষয়টি আলোচ্য উক্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

আওয়ালপুরে জাঁদরেল পিরের আগমন হলে মহব্বতনগর গ্রামের মানুষ মজিদকে তোয়াক্কা না করে সেখানে গিয়ে ভিড় জমায়। মজিদ অস্তিত্ব-সংকটের বিষয়টি বুঝতে পেরে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। উপস্থিত অনেকেই মজিদকে চিনে কিন্তু আজ তাকে কেউ যেন চিনে না। প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে এ বিষয়টিই ব্যক্ত করা হয়েছে।

'এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়। সচ্ছলতার শিকড় গাড়াবৃক্ষ।' উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : অস্তিত্ব-সংকট কাটিয়ে মজিদ এখন অর্থ, সম্পদ আর প্রতিপত্তির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত, যা তার ভিতকে শক্তিশালী করেছে।

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে মজিদ উপস্থিত হয় মহব্বতনগর গ্রামে। সেখানে এক প্রাচীন কবরকে সে মোদাচ্ছের পিরের মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং মাজার ব্যবসা শুরু করে। যার মাধ্যমে সে অল্প সময়ের মধ্যে মহব্বতনগর গ্রামে নিজের সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। এভাবেই সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা থেকে একসময় শিকড়গাড়া বৃক্ষে পরিণত হয়।

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখুন

১০. শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।

উৎস : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'লালসালু' উপন্যাস থেকে আলোচ্য উক্তিটি নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : শস্যহীন জনবহুল অঞ্চলের ক্ষুধা-দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের অতিরিক্ত ধর্মভীরুতা প্রসঙ্গে লেখক এ উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : মজিদ এমন এক এলাকার বাসিন্দা, যেখানে আবাদযোগ্য জমি থাকলেও জনসংখ্যার তুলনায় তা নিতান্তই কম। এই এলাকার মানুষ শূন্য পেটের অপূর্ণতার বেদনা ভোলার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই আমসিপারা পড়ে কোরআনে হাফেজ হয়। কোরআনে হাফেজ হলেও এই সমাজে প্রকৃত ধর্মের আলো পৌঁছায় না। ফলে একসময় শস্যহীন এই সমাজের হাফেজরা বাঁচার তাগিদে ধর্মের অপব্যবহার করে।

১১. ধান দিয়া কী হইবো, মানুষের জান যদি না থাকে।

উৎস : আলোচ্য উক্তিটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'লালসালু' উপন্যাস থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : ঝড়ের পর জমিলাকে মাজার থেকে নিয়ে আসা প্রসঙ্গে রহিমা আলোচ্য উক্তিটি করেছে। এখানে রহিমার মাতৃত্বের জাগরণ ও প্রাণধর্মের প্রেরণাকে বোঝানো হয়েছে।

বিশ্লেষণ : স্বামী মজিদের শাসনে রহিমা এতদিন নিজের ব্যক্তিত্বকে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু জমিলার আগমনে তার মাতৃত্বের অনুভূতি তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। তাই মজিদ যখন জমিলাকে শাস্তি দিতে শুরু করে তখন তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে। এ কারণে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বামীর আদেশ তার কাছে পৌঁছায় না। বরং মাজার ঘরে অন্ধকারে বেঁধে রাখা জমিলার জন্যই তার প্রাণ কাঁদে। মজিদের শাসনের ফাঁপা প্রতাপ রহিমার কাছে ধরা পড়ে যায়। তার মাতৃত্বের অনুভূতি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। ফলে তার মুখে বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর [ক-ঘ] উত্তর দাও :

হাজীপুর গ্রাম থেকে শহর অনেকটা দূরে অবস্থিত। প্রকৃতি উদার হাতে এ অঞ্চলের মানুষকে শস্যে ও সম্পদে সুখী রেখেছে। এ অঞ্চলের মানুষের দিন কাটে ফসলের খেতে, গৃহস্থালি কাজে, হাসি-উৎসবে ও প্রচলিত বিশ্বাসে। এ গ্রামের মাতব্বর ফরমান আলীর বাড়িতে এক পড়ন্ত বিকালে মতলব মিয়া নামে এক অচেনা দরবেশের আগমন ঘটে। দুর্গম পথ পার হয়ে আসা মতলব মিয়ার চোখে-মুখে আশঙ্কা, উদ্‌বেগ ও স্বপ্নের বিচিত্র আভাস। সবার সামনে সে নিজেকে পির হিসেবে পরিচয় দিয়ে নানা রকম অলৌকিক কর্মকাণ্ডের গল্প বলতে শুরু করে।

ক. ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নাম কী?

উত্তর : ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নাম মতলুব খাঁ।

খ. 'মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু কাপড় আবৃত মাজার থেকে' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মজিদের শক্তির প্রধান হাতিয়ার যে মাজার ঔপন্যাসিক এখানে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ ভিন গাঁ থেকে এসে মহব্বতনগর গ্রামে কথিত মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে কেন্দ্র করে আস্তানা গেড়ে বসে। মোদাচ্ছের পিরের মাজারকে ব্যবহার করে গ্রামের সাধারণ মানুষকে মজিদ ধর্মীয় জালে বন্দি করে। গ্রামের খালেক ব্যাপারীও সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের শক্তির কাছে হার মানে। ঔপন্যাসিক তাদের দুজনের ক্ষমতার উৎস বর্ণনা করতে গিয়ে মজিদের প্রসঙ্গে এ কথাগুলো বলেন।

গ. উদ্দীপকের মতলব মিয়া এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ আত্মপরিচয়দানে ও আত্মপ্রকাশে কতটা অভিন্ন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উদ্দীপকের মতলব মিয়া এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ আত্মপরিচয়দানে ও আত্মপ্রকাশে আংশিক অভিন্ন।

উদ্দীপকে মতলব মিয়া একজন ধর্মব্যবসায়ী। অবস্থা বুঝে সে হাজীপুর গ্রামে প্রবেশ করে। এখানে এসে সে নিজেকে পির বলে পরিচয় দেয় এবং নানা রকম কথা বলে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে চায়।

'লালসালু' উপন্যাসের মজিদও একজন ভণ্ড, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী। সে মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে একটি পুরনো কবরকে মোদাচ্ছের পিরের কবর বলে প্রচার করে। এ ছাড়া নিজেকে পিরের অনুসারী বলে বলে দাবি করে। মজিদ একটি পুরনো কবর আবিষ্কার করলেও উদ্দীপকের মতলব মিয়া তা করেননি। তবে তারা দুজনেই ভণ্ড ও ধর্ম ব্যবসায়ী। তাই বলা যায়, তাদের আত্মপরিচয়দান ও আত্মপ্রকাশ আংশিক অভিন্ন।

ঘ. "উদ্দীপকের গ্রামীণ জীবন যেন 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের খণ্ডিত রূপ" এ মন্তব্য কতটা যৌক্তিক? মূল্যায়ন কর।

উত্তর : "উদ্দীপকের গ্রামীণ জীবন 'লালসালু' উপন্যাসের মহব্বতনগর গ্রামের খণ্ডিত রূপ" এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

উদ্দীপকে হাজীপুর গ্রামটি শহর থেকে একটু দূরে অবস্থিত। এ গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। ফলে তাদের মধ্যে বিরাজ করে নানা ধরনের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। ধর্ম ব্যবসায়ীরা সহজেই এখানে ফাঁদ পাততে পারে। তাই মতলব মিয়ার মতো ধর্ম ব্যবসায়ীরা মিথ্যা গল্প তৈরি করে সহজেই সহজ-সরল গ্রামবাসীর সাথে প্রতারণা করতে পারে।

আর 'লালসালু' উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামবাসী আধুনিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। গ্রামে আধুনিক শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ নেই। তাই তারা অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী। ফলে তাদের মধ্যে বিরাজ করে নানা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার, যা তাদেরকে সবকিছু থেকে পিছিয়ে দেয়।

উপন্যাসের গ্রামবাসীর মাঝে অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসসহ সব ভুল ধারণা বিরাজমান। আর উদ্দীপকের গ্রামবাসী এরই বাস্তবিক প্রতিফলন। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।' কার চোখ? [ব্যবসায় : ২৩-২৪; ৭ কলেজ বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক রহিমার খ জমিলার গ আক্কাসের ঘ মজিদের **উ: খ**

০২. 'লালসালু' উপন্যাসে প্রদীপের আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে– [খ ২২-২৩]
ক আওয়ালপুরের পীর সাহেবকে খ রহিমাকে গ জমিলাকে ঘ মজিদকে **উ: ঘ**

০৩. 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সেই চোখ।' কার চোখ? [ক ২২-২৩]
ক মজিদের খ রহিমার গ আক্কাসের ঘ গ্রামবাসীর **উ: ঘ**

০৪. 'লালসালু' উপন্যাসে 'প্রাণধর্মের সহজ প্রকাশের' প্রতীক নারীচরিত্র– [B : ২১-২২, রাবি B১৭-১৮]
ক রহিমা খ জমিলা গ আমেনা বিবি ঘ হাসুনির মা **উ: খ**

০৫. 'পাথর এবার হঠাৎ নড়ে' চরণে উল্লেখকৃত 'পাথর' হলো– [B : ২১-২২, রাবি A : ২১-২২]
ক মজিদ খ মাজার গ সমাজ ঘ খালেক **উ: ক**

০৬. ২০২২ সালে যে সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ– [E : ২১-২২]
ক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খ সৈয়দ মুজতবা আলী
গ শওকত ওসমান ঘ সরদার জয়েনউদ্দীন **উ: ক**

০৭. 'ও কি ঘরে বালা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে' উক্তিটি করেছিল– [খ ১৯-২০]
ক খালেক ব্যাপারী খ মজিদ গ রহিমা ঘ জমিলা **উ: খ**

০৮. বয়স হলে এরা আর কিচ্ছু না হোক– [ঘ ১৯-২০]
ক অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায় খ দেহটা গেলেই হয়, এমন ভাবনা ভাবে
গ শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে ঘ এরা ছুটতে শেখে **উ: গ**

০৯. 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ কেমন ছিল? [চ ১৯-২০]
ক ভীতিকর খ কাব্যিক গ নাটকীয় ঘ স্বাভাবিক **উ: গ**

১০. মজিদের প্রতি রহিমার অচঞ্চল আস্থা যার সঙ্গে তুল্য হয়েছে– [খ ১৮-১৯]
ক সূর্য খ ইস্পাত গ ধ্রুবতারা ঘ হীরকখণ্ড **উ: গ**

১১. 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।' 'লালসালু' উপন্যাসে গ্রামবাসী সম্পর্কে লেখকের এ মন্তব্যের তাৎপর্য– [খ ১৮-১৯]
ক আত্মবিধ্বংসী ধর্মান্ধতা খ যুক্তিনিষ্ঠ আনুগত্য
গ বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বান্দ্বিকতা ঘ অপরিসীম বিনয় **উ: ক**

১২. 'প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে।' মজিদের এ ক্ষোভ যার আচরণের প্রতিক্রিয়ায়– [খ ১৭-১৮]
ক জমিলা খ পির সাহেব গ ধলা মিয়া ঘ ব্যাপারী **উ: ক**

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. চলিত রীতিতে লেখা রচনা- [গ ০৯-১০]
ক অর্ধাঙ্গী খ একটি তুলসী গাছের কাহিনী গ যৌবনের গান ঘ বিলাসী **উ: খ**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা– থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ্।'- উক্তিটি কে কাকে করেছে? [C : ২৩-২৪]
ক রহিমা, আমেনা বিবিকে খ রহিমা, জমিলাকে
গ মজিদ, রহিমাকে ঘ মজিদ, জমিলাকে **উ: গ**

০২. 'তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?' প্রশ্নটি কে কাকে করেছে? [C : ২৩-২৪]
ক মজিদ, খালেক ব্যাপারীকে খ রহিমা, জমিলাকে
গ মজিদ, তাহেরের বাবাকে ঘ রহিমা, হাসুনির মাকে **উ: গ**

০৩. "দুনিয়াটা বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র।" 'লালসালু' উপন্যাসে উক্তিটি করেছেন-[B : ২৩-২৪]
ক খালেক ব্যাপারী খ রহিমা গ মজিদ ঘ আমেনা বিবি **উ: গ**

০৪. 'পোলা মাইনষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে –তা নিয়ে আর কী কমু।' মজিদের মতে এই 'বদ খেয়াল' হলো– [C : ২৩-২৪]
ক আক্কাস কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠা করার বাসনা।
খ এলাকার ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার বাসনা।
গ শুদ্ধ A ও B
ঘ উপরের সবগুলোই অশুদ্ধ **উ: গ**

০৫. 'কলমা জানস্ না ব্যাটা?' উক্তিটি কে কাকে করেছে? [C : ২৩-২৪]
ক মজিদ, দুদু মিঞাকে খ মজিদ, খালেক ব্যাপারীকে
গ খালেক ব্যাপারী, দুদু মিঞাকে ঘ খালেক ব্যাপারী, তাহেরকে **উ: গ**

০৬. 'মাজারের সালু কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে।' কার বিড় বিড় আওয়াজে এমন শোনায়? [C : ২৩-২৪]
ক জামিলার খ রহিমার গ আমেনা বিবির ঘ হাসুনির মায়ের **উ: গ**

০৭. "L' arbre sans racines" বাংলা সাহিত্যের কোন উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদ? [D : ২৩-২৪]
ক খোয়াবনামা খ সারেং বউ গ কাশবনের কন্যা ঘ লালসালু **উ: গ**

০৮. ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি বাতাসহীন নিস্তব্ধ আবহাওয়াকে কী বলে? [D : ২৩-২৪]
ক নিরাক পড়া খ তালপাকা গরম গ জ্বালাময় দুপুর ঘ গুমোট **উ: ক**

০৯. 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের আনা শাড়িটির বৈশিষ্ট্য– [B ২২-২৩]
ক গোলাপী রং, কালো পাড় খ বেগুনি রং, কালো পাড়
গ সাদা রং, লাল পাড় ঘ হলুদ রং, সবুজ পাড় **উ: খ**

১০. কোন ঔপন্যাসিক এর মতে কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ নিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত? [B : ২১-২২]
ক নিকোলা মার্কার খ জুলিয়ান বার্নেস
গ ই এম ফর্স্টার ঘ এলিজাবেথ বেনজার **উ: গ**

১১. 'লালসালু' উপন্যাসে কত বছর অন্তর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয়? [B : ২১-২২]
ক 1/2 বছর খ 2 বছর গ 2/3 বছর ঘ 3 বছর **উ: গ**

১২. মজিদ কোথা থেকে মহব্বতনগর গ্রামে আসে? [B : ২১-২২]
ক মতিগঞ্জ খ আওয়ালপুর গ গারো পাহাড় ঘ নাসিরনগর **উ: গ**

১৩. উপন্যাস বিশ্লেষকগণ একটি সার্থক উপন্যাসের কয়টি উপাদানের কথা বলেছেন? [B : ২১-২২]
ক 6টি খ 5টি গ 7টি ঘ 8টি **উ: ক**

১৪. 'লালসালু' উপন্যাসের 'উচক্কা' শব্দটি দিয়ে নিচের কোন অর্থ বোঝানো হয়েছে? [B : ২১-২২]
ক ডানপিঠে খ বন্ধ্যা নারী গ অতি বৃদ্ধ ঘ অতি উচ্চ শব্দের চিৎকার **উ: ক**

১৫. 'লালসালু' উপন্যাসে গ্রামে কে একটি স্কুল বসাতে চেয়েছিল? [B : ২১-২২, চবি B1 : ২১-২২]
ক খালেক ব্যাপারী খ মোদাচ্ছের মিঞা গ আক্কাস ঘ তাহের **উ: গ**

১৬. 'লালসালু' উপন্যাসে বাংলা কোন মাসে তাহের কাদের ভ্রাতৃত্বয় মজিদকে দেখতে পায়? [B : ২১-২২]
ক বৈশাখের শেষে খ আষাঢ়ের শুরুতে গ শ্রাবণের শেষে ঘ কার্তিকের মধ্যভাগে **উ: গ**

১৭. 'লালসালু' উপন্যাসে চোখে বিস্ময়ের ভাব নিয়ে তাহের কাকে দেখছিল? [B : ২১-২২]
ক মজিদের বড় বউ রহিমাকে খ মজিদের ছোট বউ জমিলাকে
গ মজিদকে ঘ হাসুনির মাকে **উ: গ**

১৮. 'মরছে নাকি? 'লালসালু' উপন্যাসে এ উক্তিটি কার? [B : ২১-২২]
ক মজিদের খ রহিমার গ জমিলার ঘ খালেকের **উ: খ**

১৯. 'লালসালু' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে? [C : ২১-২২, রাবি C১৭-১৮]
ক ১৯৬৪ খ ১৯৬২ গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৪৯ **উ: গ**

২০. 'তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা।' এখানে 'তানার' নাম– [C : ২১-২২]
ক মোতাব্বের খ মোদাব্বের গ মোদাচ্ছের ঘ মোকাব্বের **উ: গ**

২১. 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।' বলতে বোঝানো হয়েছে– [C : ২১-২২]
ক অভাব-অনটন, ধর্মভীরুতা, জনসংখ্যার আধিক্য
খ অভাবগ্রস্ততা, ধর্মভীরুতা, আত্মবিশ্বাস গ প্রচণ্ড অভাব, কৃষিনির্ভরতা, ধর্মভীরুতা
ঘ যন্ত্রণাময় জীবন, ধর্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা **উ: ক**

২২. সর্বদর্শী অবস্থান থেকে কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে কোন রচনাটিতে? [C ১৮-১৯]
ক লালসালু খ অপরিচিতা গ বিলাসী ঘ আহ্বান **উ: ক**

২৩. 'তুমি কী মনে করো মিয়া? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?' উক্তিটি কার? [C, ১৭-১৮]
ক খালেক খ মজিদ গ তাহেরের বাপ ঘ রহিমা **উ: খ**

২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনা নয় —— [C, ১৭-১৮]
ক কাঁদো নদী কাঁদো খ উজানে মৃত্যু গ চাঁদের অমাবস্যা ঘ চার অধ্যায় **উ: খ**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নাফরমানি করিও না'- কথাটি কে বলেছে? [A : ২৩-২৪]
ক জমিলা খ রহিমা গ খালেক ব্যাপারী ঘ মজিদ **উ: খ**

০২. 'লালসালু' উপন্যাসে 'বাহে মুলুক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [A : ২৩-২৪]
ক উত্তরাখণ্ডকে খ উত্তরপ্রদেশকে গ উত্তর কোরিয়াকে ঘ উত্তরবঙ্গকে **উ: খ**

০৩. হাস্নাহেনার মিষ্টি-মধুর গন্ধ ছড়ায় কার কণ্ঠে? [A : ২৩-২৪]
ক খালেক ব্যাপারী খ মাতবর রেহান আলীর
গ জোয়ান মদ্দ কালুর ঘ পীর মজিদের **উ: খ**

CamScanner

৪. 'লালসালু' উপন্যাসে 'দেশটা কেমন মরার দেশ।' কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? [A ২২-২৩]
ক) ...বা প্রবণতা খ) ধর্মহীনতা গ) কর্ম সংকট ঘ) ফসল স্বল্পতা উ: ঘ

৫. '...দিয়ে কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে' কথাটি 'লালসালু' উপন্যাসে বলেছিলেন- [A ২২-২৩]
ক) মজিদ খ) জমিলা গ) আক্কাস ঘ) রহিমা উ: ক

৬. 'মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে।' এখানে 'অন্য কথা' হলো- [B ২২-২৩]
ক) দ্বিতীয় বিয়ে খ) নারীসঙ্গ গ) সম্পত্তির লোভ ঘ) বদ মতলব উ: ক

৭. 'লালসালু' উপন্যাসের প্রকৃত প্রতিপাদ্য- [A : ২১-২২]
ক) ...র ব্যবসা খ) সামাজিক অনাচার
গ) গ্রামীণ জীবন ঘ) ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট উ: ক

৮. "...ভেতরে দ্বার নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।" এখানে কার চোখের কথা বলা হয়েছে? [ঢাবি B : ২১-২২, ৭ কলেজ Business : ২১-২২, বেরোবি A ১৬-১৭]
ক) রহিমার খ) জমিলার গ) মজিদের ঘ) গ্রামবাসীর উ: ক

৯. 'লালসালু' উপন্যাসে রহিমার পেটে কত প্যাচ বেড়ি রয়েছে? [A : ২১-২২]
ক) পাঁচ খ) সাত গ) এগারো ঘ) চৌদ্দ উ: খ

১০. মতিগঞ্জের সড়কের কাছে এসে পড়ে কাদের নৌকা? [A ১৯-২০]
ক) তাহেরদের খ) আক্কাসদের গ) মজিদদের ঘ) খালেকদের উ: ক

১১. 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [C, ১৮-১৯]
ক) ১৯৬৮ খ) ১৯৪৮ গ) ১৯১২ ঘ) ১৮৬৮ উ: ক

১২. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি কার রচনা? [K ১৭-১৮; E ১৫-১৬]
ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খ) সৈয়দ মুজতবা আলী
গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ) শওকত ওসমান উ: ক

১৩. 'সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারার জন্য' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক) মজিদের ক্ষোভ খ) মজিদের হিংসা
গ) মজিদের লালসা ঘ) মজিদের প্রতিশোধের নেশা উ: ঘ

১৪. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত উপন্যাস? [A, Even, সেট A: ১৪-১৫; G ১৬-১৭]
ক) পদ্মা মেঘনা যমুনা খ) কাঁদো নদী কাঁদো
গ) ঢোঁড়াই চরিত মানস ঘ) পুতুলনাচের ইতিকথা উ: খ

১৫. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি- [B, Even, সেট 8: ১৪-১৫]
ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক খ) ভাষা আন্দোলন বিষয়ক
গ) দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ঘ) দেশভাগ পরবর্তী মানবিক বিপর্যয় বিষয়ক উ: ঘ

১৬. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'র মূল বিষয়বস্তু- [D, অবাণিজ্য, সেট ২: ১৪-১৫]
ক) দরিদ্রতা খ) সংখ্যালঘু সমস্যা গ) বৃক্ষবন্দনা ঘ) প্রতিবাদ উ: খ

১৭. মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে রহিমা কার জন্য শান্তির প্রার্থনা করে? [A ১৬-১৭]
ক) দুলুর বাপের জন্য খ) হাসুনির মার জন্য
গ) দুদু মিঞার জন্য ঘ) খালেক ব্যাপারীর জন্য উ: ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লালসালু' উপন্যাসের শুরুতেই কোন সড়কের নাম উল্লেখ করা হয়েছে? [B : ২৩-২৪]
ক) মহব্বতনগর সড়ক খ) মীরগঞ্জ সড়ক
গ) আওয়ালপুর সড়ক ঘ) মতিগঞ্জ সড়ক উ: ঘ

০২. 'লালসালু'-তে মহব্বতনগর ছাড়া আর কোন গ্রামের উল্লেখ রয়েছে? [D : ২৩-২৪]
ক) আবদুল্লাহপুর খ) আওয়ালপুর গ) মোহাম্মদপুর ঘ) মীরপুর উ: খ

০৩. 'কলমা জান মিঞা' উক্তিটি কার? [D : ২৩-২৪]
ক) খালেক ব্যাপারী খ) মজিদ গ) তাহের-কাদেরের বাপ ঘ) আক্কাস উ: খ

০৪. 'তরঙ্গভঙ্গ' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোন ধরনের গ্রন্থ? [D] ২৩-২৪]
ক) উপন্যাস খ) ছোটগল্প গ) নাটক ঘ) প্রবন্ধ উ: গ

০৫. 'কলমা জান মিঞা'? একথা মজিদ কাকে জিজ্ঞাসা করেছিল? [A : ২৩-২৪; জাবি C : ২১-২২, রাবি B : ২১-২২]
ক) ধলা মিঞাকে খ) আক্কাসকে
গ) তাহের-কাদেরের বাপকে ঘ) দুদু মিঞাকে উ: ঘ

০৬. "পাথর এবার হঠাৎ নড়ে।" 'লালসালু' উপন্যাসের এই বাক্যে 'পাথর' বলতে বোঝানো হয়েছে- [A ২২-২৩]
ক) খালেক ব্যাপারীকে খ) মজিদকে গ) মতলুব খাঁকে ঘ) জমিলাকে উ: খ

০৭. মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে যে ছুরা তা হলো... [B] ২২-২৩]
ক) ছুরা আল ফালাক খ) ছুরা কাওছার গ) ছুরা আন নাছ ঘ) ছুরা দোখান উ: ক

০৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লালসালু উপন্যাসটির চরিত্র- [B ২২-২৩]
ক) জোবেদা খ) সিকদার গ) ধলা মিয়া ঘ) রমজান উ: গ

০৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত সর্বশেষ নাটক কোনটি? [D ২২-২৩]
ক) নয়নতারা খ) চাঁদের অমাবস্যা গ) উজানে মৃত্যু ঘ) সবক'টি উ: গ

১০. 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের শিরোনাম কী? [D ২২-২৩]
ক) The Tree Without Roots খ) The Tree With Roots
গ) The Rootless Tree ঘ) Tree Without Roots উ: ক

১১. 'লালসালু' উপন্যাসের শেষ বাক্যটি হলো— [D : ২১-২২]
ক) দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা খ) নাফরমানি করিও না
গ) বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ ঘ) সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে উ: গ

১২. 'তোমার জন্য আমার মায়া হয়।' 'লালসালু' উপন্যাসে এই উক্তিটি কার উদ্দেশ্যে? [D : ২১-২২]
ক) মজিদের খ) হাসুনির মার গ) জমিলার ঘ) রহিমার উ: গ

১৩. 'সে ঝংকার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে' লালসালু উপন্যাসে সে ঝংকার বলতে বোঝানো হয়েছে- [B1 : ২১-২২]
ক) কেরাতের সুর খ) নদীর কল্লোল
গ) রহিমার হাতের চুড়ির শব্দ ঘ) কোকিলের কুহু তান উ: ক

১৪. 'উজানে মৃত্যু' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর একটি- [B1 : ২১-২২]
ক) নাটক খ) উপন্যাস গ) কাব্য ঘ) আত্মজীবনী উ: ক

১৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল- [B : ২১-২২]
ক) প্যারিস খ) লন্ডন গ) জার্মানি ঘ) ইটালি উ: ক

১৬. মজিদের মুখে থু থু দিয়েছিল কে? [B : ২১-২২]
ক) রহিমা খ) আমেনা বিবি গ) জমিলা ঘ) হাসুনির মা উ: গ

১৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র কোন বইটি চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাস হিসেবে পরিচিত? [B : ২১-২২]
ক) সুড়ঙ্গ খ) কাঁদো নদী কাঁদো গ) উজানে মৃত্যু ঘ) দুই তীর উ: খ

১৮. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র নাটক নয়? [A : ২১-২২]
ক) তরঙ্গভঙ্গ খ) বহিপীর গ) উজানে মৃত্যু ঘ) চাঁদের অমাবস্যা উ: ঘ

১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র জন্ম কত সালে? [A : ২১-২২]
ক) ১৯২০ খ) ১৯২১ গ) ১৯২২ ঘ) ১৯২৪ উ: গ

২০. মহব্বতনগর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম কী? [A : ২১-২২]
ক) রহমতপুর খ) হরতনপুর গ) রায়পুর ঘ) আওয়ালপুর উ: ঘ

২১. 'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।' 'লালসালু' উপন্যাসে কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে? [B ১৯-২০; ইবি B ১৭-১৮]
ক) মজিদ খ) জমিলা গ) রহিমা ঘ) খ্যাংটা বুড়ি উ: খ

২২. 'চাঁদের অমাবস্যা' কোন ধরনের রচনা? [ঙ ০৩-০৪]
ক) কাব্যগ্রন্থ খ) প্রবন্ধগ্রন্থ গ) ছোটগল্প ঘ) উপন্যাস উ: ঘ

২৩. 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'র মূল সুর কী? [খ ০৯-১০]
ক) মানবিকতা খ) রাজনীতি গ) ধর্মপ্রাণতা ঘ) চরিত্র-প্রাধান্য উ: ক

২৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? [E -১৩-১৪; H ১৬-১৭]
ক) চট্টগ্রাম খ) নোয়াখালী গ) কুমিল্লা ঘ) ঢাকা উ: ক

২৫. 'বহিপীর' কার রচনা? [B -১৩-১৪; ইবি হ ০৪-০৫]
ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খ) কাজী আবদুল ওদুদ
গ) সৈয়দ শামসুল হক ঘ) শওকত ওসমান উ: ক

২৬. কোন ঔপন্যাসিক ফ্রান্সে অবস্থানকালীন বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনা করেছিলেন? [C-১৫-১৬]
ক) হ্যানা ক্যাথারিন মলেন্স খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) নীরদ মজুমদার ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উ: ঘ

২৭. 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [D-১৫-১৬]
ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ খ) হুমায়ূন আহমেদ
গ) জহির রায়হান ঘ) আবু জাফর শামসুদ্দীন উ: ক

২৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কত বছর বেঁচেছিলেন? [B, B2,B3 ১৬-১৭]
ক) ৭১ বছর খ) ৪৯ বছর গ) ২২ বছর ঘ) ৪৭ বছর উ: খ

২৯. 'লালসালু' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি? [D1 ১৬-১৭]
ক) জাহেদা খ) রাহেলা গ) কালু মিয়া ঘ) ধলা মিয়া উ: ঘ

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।' এই নিশানাটি কী? [B : ২৩-২৪]
ক) তালগাছ খ) সালু
গ) তানু বিবির সন্তান ঘ) মোদাচ্ছের পীরের মাজার উ: ক

০২. 'সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।'- 'লালসালু' উপন্যাসে কার সম্পর্কে কথাটি বলা হয়েছে? [B : ২৩-২৪]
ক) জমিলা খ) আমেনা বিবি গ) রহিমা ঘ) তানু বিবি উ: খ

০৩. 'দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে।' এই উক্তির নেপথ্যে মজিদের কোন বোধ কাজ করেছে? [B : ২৩-২৪]
ক) আনন্দ খ) সাহস গ) ভয় ঘ) বিস্ময় উ: গ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৪. মজিদের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যাপারে অবিশ্বাসপোষণকারী চরিত্রের নাম- [B ২২-২৩]
(ক) তাহের (খ) তাহের-কাদেরের পিতা
(গ) রহিমা (ঘ) খালেক ব্যাপারী উ: (খ)

০৫. 'হে আমার মুখে থুতু দিল।' কে, কার মুখে থুতু দিয়েছে? [B ২২-২৩]
(ক) রহিমা মজিদের মুখে (খ) মজিদ জমিলার মুখে
(গ) জমিলা রহিমার মুখে (ঘ) জমিলা মজিদের মুখে উ: (ঘ)

০৬. 'লালসালু' উপন্যাসের সংলাপ কোন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে? [B ২২-২৩]
(ক) চট্টগ্রাম (খ) কুমিল্লা (গ) নোয়াখালি (ঘ) বরিশাল উ: (গ)

০৭. মজিদের তৈরি মাজারটির আকৃতি ছিল- [A ২২-২৩]
(ক) উটের পিঠের মতো (খ) নৌকার ছাউনির মতো
(গ) বাঁকা চাঁদের মতো (ঘ) মাছের পিঠের মতো উ: (ঘ)

০৮. 'লালসালু' উপন্যাসের ফরাসি অনুবাদক কে? [A ২২-২৩]
(ক) আলবেয়ার কামু (খ) আনি এর্নো
(গ) সিমোন দ্য বোভোয়ার (ঘ) আন-মারি উ: (ঘ)

০৯. 'তানি বুঝি দুলার বাপ।' 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলার এই উক্তি কার প্রসঙ্গে? [A ২২-২৩]
(ক) মজিদ (খ) আক্কাস (গ) তাহেরের বাপ (ঘ) তাহের উ: (ক)

১০. 'বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই করা সে-চোখ।' কার চোখ? [C ২২-২৩]
(ক) মজিদের (খ) রহিমার
(গ) খালেক ব্যাপারীর (ঘ) মহব্বতনগর গ্রামবাসীর উ: (খ)

১১. 'লালসালু' উপন্যাসে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কে? [C ২২-২৩]
(ক) খালেক ব্যাপারী (খ) মজিদ (গ) আক্কাস (ঘ) তাহের উ: (গ)

১২. 'লালসালু' উপন্যাসে ধলা মিয়া কে? [C : ২১-২২]
(ক) জমিলার বড় ভাই (খ) জমিলার ছোট ভাই
(গ) খালেক ব্যাপারীর বড় ভাই (ঘ) তানু বিবির বড় ভাই উ: (ঘ)

১৩. মাঠে পাকা ধান দেখে যাদের মনে ভক্তিভাব জেগে ওঠে মজিদের দৃষ্টিতে তারা কীসের পূজারি? [B : ২১-২২]
(ক) ভূত (খ) পীর (গ) মাঠ (ঘ) ফসল উ: (ক)

১৪. মজিদকে প্রথমবার দেখে জমিলা কী ভেবেছিল? [B : ২১-২২]
(ক) বর (খ) ঘটক (গ) শ্বশুর (ঘ) মৌলভি উ: (গ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [B ১৮-১৯]
(ক) ধর্মীয় গোঁড়ামি বেশি (খ) ধর্মীয় অনুশাসন কম
(গ) ধর্মের প্রভাব কম (ঘ) ধর্মীয় অনুশাসন বেশি উ: (ক)

০২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোন রচনাটি অন্য তিনটি থেকে আলাদা? [ক. মা. ১০-১১]
(ক) লালসালু (খ) চাঁদের অমাবস্যা
(গ) কাঁদো নদী কাঁদো (ঘ) দুই তীর উ: (ঘ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'উপন্যাস' এর আক্ষরিক অর্থ কী? [AP ১৮-১৯]
(ক) বিশেষ রূপে উপস্থাপন (খ) ঘটনার বিশদ বর্ণনা
(গ) চরিত্রের ধারাবাহিক বিন্যাস (ঘ) ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উ: (ক)

০২. 'লালসালু' উপন্যাসটির লেখক কে? [C ১৮-১৯]
(ক) মুনীর চৌধুরী (খ) শওকত আলী
(গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উ: (ঘ)

০৩. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক? [AL ১৭-১৮]
(ক) নয়নচারা (খ) কাঁদো নদী কাঁদো (গ) উজানে মৃত্যু (ঘ) কালবেলা উ: (গ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অমন করে হাঁটতে নাই' কে বলে? [B ১৯-২০]
(ক) খালেক ব্যাপারী (খ) ধলা মিয়া
(গ) মজিদ (ঘ) মতলুব খাঁ উ: (গ)

০২. 'তোমার দাড়ি কই মিয়া?' উক্তিটি কার? [A ১৭-১৮]
(ক) মোদাব্বেরের (খ) মজিদের
(গ) খালেক ব্যাপারীর (ঘ) আক্কাসের উ: (খ)

০৩. মজিদ কার চোখে ভয় দেখেছে? [A ১৭-১৮]
(ক) আমেনার (খ) হাসুনির মা (গ) রহিমার (ঘ) জমিলার উ: (ঘ)

০৪. 'লালসালু' উপন্যাসে 'নিরাক পড়া' অর্থে কী বোঝানো হয়েছে? [A ১৭-১৮]
(ক) গ্রীষ্মের গরম আবহাওয়া (খ) অস্পষ্ট বিবর্ণ দিন
(গ) নিস্তব্ধ গুমোট আবহাওয়া (ঘ) ঝিমধরা দুপুর উ: (গ)

০৫. 'লালসালু' উপন্যাসে প্রতিবাদের প্রতীক কে? [C ১৭-১৮]
(ক) মজিদ (খ) জমিলা (গ) রহিমা (ঘ) মাতব্বর উ: (খ)

০৬. মহব্বতনগর গ্রামে মজিদকে প্রথম দেখেছিল কে? [C ১৬-১৭]
(ক) তাহের ও কাদের (খ) খালেক ও আক্কাস
(গ) রহিমা ও জমিলা (ঘ) খালেক ও আমেনা উ: (ক)

০৭. আক্কাসের বাবার নাম কী? [A ১৬-১৭]
(ক) তাহের (খ) কাদের (গ) মোদাব্বের (ঘ) খালেদ উ: (গ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লালসালু' উপন্যাসে হাসপাতাল কোথায় অবস্থিত? [B : ১৯-২০]
(ক) মতিগঞ্জে (খ) করিমগঞ্জে (গ) মহব্বতনগরে (ঘ) আওয়ালপুরে উ: (খ)

০২. 'ওনারে কন, আমার মওতের জন্য জানি দোয়া করে' উক্তিটি কার? [B ১৭-১৮]
(ক) রহিমা (খ) জমিলা (গ) আমেনা (ঘ) হাসুনির মা উ: (ঘ)

০৩. 'ঢেঙা বুড়া' কার কথায় বিভ্রান্ত হয়? [B ১৭-১৮]
(ক) মজিদ (খ) খালেক ব্যাপারী (গ) বুড়ি (ঘ) হাসুনির মা উ: (ক)

০৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্মসূত্রে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন- [B -১৩-১৪]
(ক) কলকাতা (খ) প্যারিস (গ) কাঠমুণ্ডু (ঘ) জাকার্তা উ: (খ)

০৫. করাচির বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে চাকরি করেন- [C -১৩-১৪]
(ক) সৈয়দ আলী আহসান (খ) জহির রায়হান
(গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (ঘ) আবু জাফর উ: (গ)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ।' কে বলেছে? [C ১৯-২০]
(ক) আমেনা বিবি (খ) হাসুনির মা
(গ) জমিলা (ঘ) রহিমা উ: (গ)

০২. 'ধান দিয়া কি হইব মানুষের জান যদি না থাকে?' এ উক্তিতে রহিমা চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে? [C ১৯-২০]
(ক) আনুগত্য (খ) মাতৃত্ব (গ) বাৎসল্য (ঘ) ঔদ্ধত্য উ: (খ)

০৩. মজিদ বুড়াকে মাজারে কয় পয়সার সিন্নি দিতে বলেছে? [B ১৮-১৯]
(ক) পাঁচ পয়সার (খ) দশ পয়সার (গ) বারো পয়সার (ঘ) কুড়ি পয়সার উ: (ক)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. লালসালু উপন্যাসে 'মাজারটি তার শক্তির মূল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [D ১৯-২০]
(ক) বিশ্বাস (খ) আনুগত্য
(গ) ভীতি (ঘ) অনুরাগ উ: (ক)

০২. 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ *Tree without Roots* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল কোন প্রকাশনী কর্তৃক? [D ১৮-১৯; G ১৭-১৮]
(ক) Editions du Seuil (খ) Lynne Rienner Publishers.
(গ) Pluto Press. (ঘ) Chatto and Windus Ltd. উ: (ঘ)

০৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? [G ১৭-১৮]
(ক) দৈনিক খাদেম (খ) স্টেটসম্যান (গ) ইত্তেফাক (ঘ) নবদূত উ: (খ)

০৪. 'লালসালু' কোন ধরনের উপন্যাস? [D ১৬-১৭]
(ক) সামাজিক (খ) ঐতিহাসিক
(গ) আধ্যাত্মমূলক (ঘ) আঞ্চলিক উ: (ক)

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থটি কার রচনা? [D -১৩-১৪]
(ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
(গ) আবু জাফর শামসুদ্দীন (ঘ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উ: (খ)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি কোনটি? [C-১৫-১৬; চবি D ১২-১৩]
(ক) লালসালু (খ) দুইতীর
(গ) কাঁদো নদী কাঁদো (ঘ) তরঙ্গভঙ্গ উ: (ক)

CamScanner

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

...মাছের পিঠের মত মাজার।' উক্তিটি কী রূপক অর্থে 'লালসালু' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে? [FASS : ২৩-২৪]
ⓐ মাজার গঠন ⓑ মাজারের রহস্যময়তা
ⓒ মজিদের ভণ্ডামি ⓓ জমিলার প্রতিবাদ — উ: খ

'লালসালু' উপন্যাসে কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? [FSSS : ২১-২২]
ⓐ ধর্মের নামে ব্যবসা ⓑ বহুবিবাহ
ⓒ অন্ধবিশ্বাস ⓓ ভাগ্যান্বেষণ — উ: গ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

...বার দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে ক্লান্তি নেই কার? [মানবিক ২২-২৩]
ⓐ ধলা মিয়ার ⓑ হাসুনির মায়ের
ⓒ আমেনা বিবির ⓓ রহিমার — উ: খ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

'লালসালু' উপন্যাসে রহিমাকে তুলনা করা হয়েছে মজিদের ঘরের ——র সঙ্গে– [কৃষি ও সমাজবিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ⓐ পাখী ⓑ খুঁটি ⓒ ভিত্তি ⓓ আঙিনা — উ: খ

'লালসালু' উপন্যাসে কোন চরিত্রের হাঁটার সময় মাটিতে আওয়াজ হয়? [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
ⓐ হাসুনির মা ⓑ আমেনা বিবি ⓒ রহীমা ⓓ জমিলা — উ: গ

মজিদ কোথায় ছিল? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ⓐ আওয়ালপুরে ⓑ গারো পাহাড়ে ⓒ নোয়াখালীতে ⓓ করিমগঞ্জে — উ: খ

'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদকের নাম কী? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ⓐ অ্যান মরি লুই রোজিতা ⓑ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
ⓒ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ⓓ নীরদ সি চৌধুরী — উ: গ

০৫. 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কী? [২২-২৩]
ⓐ রহিমা ⓑ হাসুনির মা
ⓒ জমিলা ⓓ আমেনা — উ: গ

০৬. 'তাই তারা ছোটে,' 'ছোটে' কেন?– [Humanities : ২১-২২]
ⓐ ধর্মের জন্য ⓑ জীবিকার জন্য
ⓒ কল্যাণের জন্য ⓓ সুবিধার জন্য — উ: খ

০৭. 'ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে?' উক্তিটি যার– [Humanities, Science: ২১-২২, বুবি B ১৯-২০]
ⓐ জমিলার ⓑ মজিদের ⓒ আক্কাসের ⓓ রহিমার — উ: খ

০৮. 'মোদাচ্ছের' কথাটির অর্থ– [Humanities : ২১-২২]
ⓐ আগন্তুক ⓑ নাম না-জানা ⓒ পরিচিত ⓓ খ্যাতিমান — উ: খ

০৯. 'মোদাচ্ছের' শব্দের অর্থ কী? [Business : ২১-২২]
ⓐ দয়ালু ⓑ ভণ্ড ⓒ পুণ্যবান ⓓ অনামা — উ: ঘ

১০. 'ও যখন হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে দেখে।' এখানে 'ও' হলো– [বেরোবি A ১৭-১৮]
ⓐ জমিলা ⓑ হাসুনির মা
ⓒ রহিমা ⓓ আমেনা বিবি — উ: গ

১১. 'এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়' ... কে? [১৮-১৯]
ⓐ রহিমা ⓑ আমেনা ⓒ মজিদ ⓓ খালেক — উ: গ

১২. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামটির নাম কী? [১৮-১৯]
ⓐ শিমুলতলি ⓑ কেতুপুর ⓒ মহব্বতনগর ⓓ দামপাড়া — উ: গ

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'লালসালু' উপন্যাসের মাজারটি দেখতে কীসের মতো? [২২-২৩]
ⓐ উইটিভি ⓑ দ্বিতীয় চাঁদ
ⓒ মাছের পিঠ ⓓ গারো পাহাড় — উ: গ

HSC পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
প্রথম যখন হোসেন মিয়া কেতুপুরে এসেছিল পরনে একটা ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় একঝাঁক রুক্ষ চুল– ঘষা দিলে গায়ে খড়ি উঠত। এখন সে অনেক সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক।

উদ্দীপকে হোসেন মিয়া ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ উভয়ের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য নয়? [ঢা. বো. ২৪]
ⓐ লোভী ⓑ আগন্তুক ⓒ সরলতা ⓓ ধার্মিক — উ: গ

আক্কাস মহব্বতনগর গ্রামে কী প্রতিষ্ঠা করতে চায়? [ঢা. বো. ২৪]
ⓐ স্কুল ⓑ কলেজ ⓒ হাসপাতাল ⓓ এনজিও — উ: ক

'লালসালু' উপন্যাসে শিকারির একাগ্রতা কার চোখে? [রা. বো. ২৪]
ⓐ কাদের ⓑ তাহের ⓒ মজিদ ⓓ কালু — উ: খ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ০৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রহিম মিয়ার স্ত্রী মরিয়ম সহজ-সরল নারী। স্বামীর প্রতি তার অটল বিশ্বাস ও ভক্তি। তার কাছে স্বামী হচ্ছে খোদার ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কামেল লোক। অথচ গ্রামের অশিক্ষিত সরল মানুষের খোদাভীতিকে কাজে লাগিয়ে রহিম মিয়া নানা ফতোয়ায় নিজের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকের মরিয়ম 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে– [রা. বো. ২৪]
ⓐ হাসুনির মা ⓑ জমিলা ⓒ আমেনা বিবি ⓓ রহিমা — উ: ঘ

'কি দেশটা কেমন মরার দেশ।' 'লালসালু' উপন্যাসের এই বাক্যে 'মরার দেশ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [রা. বো. ২৪; চ. বো. ২২]
ⓐ জনশূন্যতা ⓑ শস্যহীনতা ⓒ শিক্ষাহীনতা ⓓ ধর্মহীনতা — উ: খ

'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ কার ভয়ে শঙ্কিত হয়? [চ. বো. ২৪]
ⓐ আওয়ালপুরের পির ⓑ জমিলা ⓒ আক্কাস ⓓ খালেক বেপারী — উ: ক

মজিদ কখন আওয়ালপুর পৌঁছেছিলো? [চ. বো. ২৪]
ⓐ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ⓑ সূর্য হেলে পড়লে
ⓒ দুপুরের পূর্বে ⓓ সূর্য ডুবে গেলে — উ: খ

"ও মিয়া, তোমার দিলে কি ময়লা আছে?" মজিদের এই উক্তিতে 'ময়লা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [চ. বো. ২৪]
ⓐ হিংসা ⓑ সন্দেহ ⓒ পাপ ⓓ রাগ — উ: খ

'লালসালু' উপন্যাসে 'পরগাছা' মুরব্বি কে? [দি. বো. ২৪]
ⓐ খালেক ব্যাপারী ⓑ সলেমনের বাপ ⓒ ধলা মিয়া ⓓ মোদাব্বের মিয়া — উ: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
স্বামী মরে যাওয়ায় বৃদ্ধ বাবার টানাপোড়েনের সংসারে মিনারাকে দুই সন্তান নিয়ে থাকতে হয়। কখনো কখনো আশেপাশের বাড়িতে ঝি- এর কাজ করে সে। এছাড়া, কাঁথা সেলাই করে, হোগলা বুনে সামান্য কিছু উপার্জন করেন মিনারা।

১০. উদ্দীপকের মিনারা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? [দি. বো. ২৪]
ⓐ রহিমা ⓑ জমিলা ⓒ আমেনা বিবি ⓓ হাসুনির মা — উ: ঘ

১১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সর্বশেষ কর্মস্থল কোনটি? [ঢা. বো. ১৯]
ⓐ করাচি ⓑ লন্ডন ⓒ জার্মানি ⓓ প্যারিস — উ: ঘ

১২. 'লালসালু' কী ধরনের উপন্যাস? [য. বো. ১৭]
ⓐ সামাজিক সমস্যামূলক ⓑ ধর্ম আশ্রিত
ⓒ আঞ্চলিক ⓓ ঘটনানির্ভর — উ: ক

১৩. 'মাজারটি তার শক্তির মূল।' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ব. বো. ১৯; চ. বো. ১৭]
ⓐ বিশ্বাস ⓑ আনুগত্য
ⓒ ভীতি ⓓ অনুরাগ — উ: ক

১৪. 'লালসালু' উপন্যাসে কে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত? [কু. বো. ১৯]
ⓐ মজিদ ⓑ সলেমানের বাপ ⓒ জমিলা ⓓ রহিমা — উ: খ

১৫. 'ওনারে কন, আমার মওতের জন্য জানি দোয় করে।' উক্তিটি কার? [ব. বো. ১৭]
ⓐ রহিমা ⓑ জমিলা
ⓒ আমেনা ⓓ হাসুনির মা — উ: ঘ

১৬. 'তানি বুঝি দুলার বাপ।' জমিলা কার সম্পর্কে এ উক্তি করে? [রা. বো. ১৬]
ⓐ খালেক ব্যাপারী ⓑ মোদাব্বের মিঞা
ⓒ মতলুব মিঞা ⓓ মজিদ — উ: ঘ

১৭. 'তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে দিন।' কাকে কষ্ট দিয়েছে ? [ব. বো. ২৩]
ⓐ হাসুনির মা ⓑ রহিমা
ⓒ জমিলা ⓓ আমেনা — উ: ক

১৮. 'খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।' এখানে 'খেলোয়াড়' কে? [সি. বো. ২২]
ⓐ আক্কাস ⓑ সলেমানের বাপ ⓒ তাহের-কাদেরের বাপ ⓓ মজিদ — উ: গ

১৯. আক্কাসের বাবার নাম কী? [দি. বো. ১৭]
ⓐ খালেক ব্যাপারী ⓑ মোবারক মিঞা
ⓒ কালু মিঞা ⓓ মোদাব্বের মিঞা — উ: ঘ

বহুপদী ও অভিন্ন তথ্যভিত্তিক MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'জাহেল' শব্দের অর্থ নয়–
i. অবিনয়ী ii. অজ্ঞ iii. ধার্মিক
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: (খ)

০২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতে, ধর্মের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে–
i. শঠতা ii. কুসংস্কার iii. অন্ধবিশ্বাস
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: (ঘ)

০৩. 'লালসালু' উপন্যাসে জমিলা হয়ে উঠেছে–
i. নারীধর্মের প্রতিনিধি ii. হৃদয়ধর্মের প্রতিনিধি iii. মানবধর্মের প্রতিনিধি
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: (ক)

০৪. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে বিদ্যমান–
i. ধর্মান্ধতা ii. ধর্মভীরুতা iii. কুসংস্কার
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: (ঘ)

০৫. 'লালসালু' উপন্যাসে বিধৃত গ্রামের মানুষের তথাকথিত পিরের মাজারভিত্তির কারণ–
i. অন্ধবিশ্বাস ii. অজ্ঞতা iii. কুসংস্কার
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: (ঘ)

০৬. 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা চেনে–
i. জমি ii. খোদা iii. ধান
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: (খ)

০৭. মজিদের শক্তির উৎস হলো–
i. খালেক ব্যাপারীর সমর্থন
ii. সালুকাপড়ে আবৃত মাজার
iii. ধর্মের ভয় দেখিয়ে লোকজনকে দুর্বল করা
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: [illegible]

☞ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়া যখন কেতুপুর প্রথম এসেছিল তখন সে ছিল খুবই দরিদ্র। পরনে ছিল একটা ছেঁড়া লুঙ্গি। সময়ের আবর্তনে এখন সে অনেক সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক।

০৮. উদ্দীপকের হোসেন মিয়া ও 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ উভয়ই–
i. সফল ii. কর্মঠ iii. ভাগ্যান্বেষী
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: [illegible]

☞ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
জামালের দুই বউয়ের মধ্যে সাজেদা ছোট। সংসারের বিষয়াদি সে বোঝে না। সুযোগ পেলে সমবয়সি বান্ধবীদের সাথে গল্প করে। হেসে-খেলে দিন কাটে তার।

০৯. সাজেদার সাথে 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা চরিত্রের সাদৃশ্যের কারণ–
i. মানসিকতায় ii. অল্পবয়সে iii. বাল্যবিবাহ
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: [illegible]

☞ নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং প্রশ্নটির উত্তর দাও :
জুবায়ের গ্রামবাসীকে গণশিক্ষা দেওয়ার জন্য একতাবদ্ধ করে। কিন্তু মৌলবি সাহেবের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের কারণে জুবায়ের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

১০. মৌলবি সাহেবের কর্মকাণ্ড 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রের যে দিকটা ইঙ্গিত করে–
i. ধর্মীয় গোঁড়ামি ii. আধিপত্য রক্ষার চেষ্টা iii. পশ্চাৎপদতা
নিচের কোনটি ঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii উ: [illegible]

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি? [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ কবর ⓚ বহিপীর
ⓖ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ⓖ ওরা কদম আলী উ: খ

০২. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের যুবক-শিক্ষকের নাম– [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ আবদুল কাদের ⓚ খতিব মিয়া
ⓖ আক্কাস আলী ⓖ আরেফ আলী উ: ঘ

০৩. কোনটি ঠিক? [২৪তম বিসিএস]
ⓚ সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস) ⓚ কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য)
ⓖ বহিপীর (নাটক) ⓖ মহাশ্মশান (নাটক) উ: [illegible]

০৪. 'লালসালু' উপন্যাসটির লেখক কে? [২১তম বিসিএস]
ⓚ মুনীর চৌধুরী ⓚ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
ⓖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ⓖ শওকত আলী উ: [illegible]

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মুখে জমিলার থুথু নিক্ষেপে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ ক্ষোভ ⓚ ক্রোধ ⓖ গর্ব ⓖ হিংসা উ: (খ)

০২. মজিদ পূর্বে কোথায় বাস করত?
ⓚ গারো পাহাড়ে ⓚ মধুপুর গড়ে ⓖ পাহাড়পুরে ⓖ সোনারগাঁয়ে উ: (ক)

০৩. মজিদের দুদু মিয়াকে শাসনের মধ্যে কোন বিষয়টি নিহিত?
ⓚ ধর্মরক্ষা ⓚ আধিপত্য বিস্তার
ⓖ নির্বিঘ্নে বিয়ে করতে পারা ⓖ কল্যাণের পথে আনা উ: (খ)

০৪. রহিমার কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে কে?
ⓚ আমেনা ⓚ হাসুনির মা ⓖ জমিলা ⓖ বুড়ি উ: (খ)

০৫. প্রথম যৌবনে মজিদ কেমন বৌ-এর স্বপ্ন দেখত?
ⓚ রহিমার মতো ⓚ হাসুনির মায়ের মতো
ⓖ জমিলার মতো ⓖ আমেনার মতো উ: (খ)

০৬. 'আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না' মজিদের এ উক্তিতে তার চরিত্রের কোন দিকটি উন্মোচিত হয়েছে?
ⓚ অস্তিত্ববোধ ⓚ অসহায়ত্ব ⓖ ভীরুতা ⓖ ধর্মবোধ উ: (খ)

০৭. গ্রামের মহিলারা কার মাধ্যমে মজিদের কাছে আর্জি পাঠায়?
ⓚ রহিমার ⓚ হাসুনির মার ⓖ হাসিনার ⓖ খালেক ব্যাপারীর উ: (ক)

০৮. মজিদ মানুষের রসনাকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছে?
ⓚ ভয়ংকর সাপের রসনার ⓚ হিংস্র বাঘের থাবার
ⓖ সিংহের গর্জনের ⓖ কুমিরের শিকারের উ: [illegible]

০৯. মজিদ হাসুনির মার জন্য কী রঙের শাড়ি এনে দেয়?
ⓚ বেগুনি রং, কালো পাড় ⓚ বেগুনি রং, লাল পাড়
ⓖ কালো রং, বেগুনি পাড় ⓖ লাল রং, বেগুনি পাড় উ: [illegible]

১০. 'সোহবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ' এর অর্থ কী?
ⓚ অসৎসঙ্গ মানুষকে খারাপ করে ⓚ সৎসঙ্গ মানুষকে সরল করে
ⓖ অসৎসঙ্গ মানুষকে ভালো করে ⓖ সৎসঙ্গ মানুষকে ভালো করে উ: [illegible]

১১. আওয়ালপুরে পিরের চেলারা কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?
ⓚ মজিদের ⓚ কালুর ⓖ তাহেরের ⓖ কাদেরের উ: [illegible]

১২. 'তোমার দাড়ি কই মিঞা' মজিদ কার উদ্দেশে উক্তিটি করেছে?
ⓚ মোদাব্বের মিঞার ⓚ তাহেরের ⓖ খালেক ব্যাপারী ⓖ আক্কাসের উ: [illegible]

১৩. আওয়ালপুরের পিরের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
ⓚ মৌসুমি পির ⓚ ভ্রাম্যমাণ পির ⓖ স্থায়ী পির ⓖ ভণ্ড পির উ: [illegible]

১৪. 'তোমার দিলে কি ময়লা আছে?' 'লালসালু' উপন্যাসে কার দিলের কথা বলা হয়েছে?
ⓚ দুদু মিঞা ⓚ তাহেরের বাপ ⓖ কাদেরের চাচ ⓖ মতলুব খাঁ উ: [illegible]

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

...সূরা আল ফালাকের কয় আয়াত তেলাওয়াত করে?
(খ) নয় (গ) সাত (ঘ) তিন উ: (ক)

...গ্রামের ক্ষমতাধর ব্যক্তির নাম কী?
...মিঞা (খ) আক্কাস (গ) মোদাব্বের মিঞা (ঘ) খালেক ব্যাপারী উ: (ঘ)

...সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে কে?
(খ) জমিলা (গ) হাসুনির মা (ঘ) আমেনা উ: (ক)

...বৃদ্ধ লোকটি' এখানে 'লোকটি' কে?
(খ) খালেক ব্যাপারী (গ) ধলা মিয়া (ঘ) হাসুনির মায়ের বাপ উ: (ঘ)

...গ্রামবাসীদের কী বলে গালি দেয়?
(খ) নাস্তিক (গ) জাহেল (ঘ) অধার্মিক উ: (গ)

...বয়স নিয়ে কটাক্ষ করে কে?
...আমেনা (খ) জমিলা (গ) ফাতেমা (ঘ) রহিমা উ: (খ)

...কয়টি বিয়ে হয়েছে?
(খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) দুটি উ: (ঘ)

...উপন্যাসে বর্ণিত সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক কে?
...খালেক ব্যাপারী (খ) আমেনা (গ) আক্কাস (ঘ) মজিদ উ: (ঘ)

...উপন্যাসে উল্লেখকৃত 'খোদার এলেমে বুক ভরে না' কেন?
...পেট শূন্য বলে (খ) কুসংস্কারের জন্য (গ) স্বার্থপরতার জন্য (ঘ) শিক্ষাহীনতার ফলে উ: (ক)

...চলে গেছে, খেলবে কার সাথে' এখানে 'খেলোয়াড়' কে?
...আওয়ালপুরের পির (খ) দুদু মিঞা (গ) জমিলা (ঘ) তাহেরের বাপ উ: (ঘ)

...শক্তি প্রতিফলিত হয় কার ওপর?
...গ্রামবাসীর ওপর (খ) রহিমার ওপর (গ) আমেনার ওপর (ঘ) জমিলার ওপর উ: (খ)

..., হাসুনির মাকে বেধড়ক প্রহার করে কেন?
...বুড়োর আদেশ অমান্য করায় (খ) মজিদকে অপমান করায়
...ঘরের কথা মজিদকে বলায় (ঘ) ঘরের বাইরে যাওয়ায় উ: (গ)

...সমাজে শিকড় গাড়তে কোনটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন?
...বিশ্বাস (খ) লোভ (গ) ধর্ম (ঘ) প্রতিপত্তি উ: (গ)

...কোন সড়কের উপর মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল?
...মহব্বতনগরের (খ) মতিগঞ্জের (গ) আওয়ালপুরের (ঘ) গারো পাহাড়ের উ: (খ)

...বিবির প্রতি মজিদের কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছে?
...দয়া (খ) স্নেহ (গ) লালসা (ঘ) ভালোবাসা উ: (গ)

...ব্যাপারীর সামনে বসে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করে কে?
...মজিদ (খ) ধলা মিয়া (গ) জমিলা (ঘ) আমেনা উ: (খ)

...আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।' কার চোখ?
...আমেনার (খ) জমিলার (গ) মজিদের (ঘ) রহিমার উ: (খ)

...বুড়োর বিচারে মজিদ কোন সূরা পাঠ করেছিলেন?
...আল ইমরান (খ) আল বাকারা (গ) আন-নহর (ঘ) আন-নূর উ: (ঘ)

...হইবেন, আমার যেন মওত হয়' এ আর্জি কার?
...আমেনা বিবি (খ) হাসুনির মায়ের (গ) রহিমার (ঘ) জমিলার উ: (খ)

...ধান নষ্ট হয়ে যায় কেন?
...ঝড়ো বৃষ্টি হলে (খ) ঘন বৃষ্টি হলে (গ) শিলা বৃষ্টি হলে (ঘ) কালবৈশাখীতে উ: (গ)

...উপন্যাস মূলত কী নির্ভর?
...বর্ণনা (খ) সংলাপ (গ) বর্ণনা (ঘ) চরিত্র উ: (ক)

...ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের বিস্তৃত ধানখেতের এক প্রান্তে কারা ছিল?
...মজিদ, রহিমা (খ) রহিমা, জমিলা (গ) তাহের, কাদের (ঘ) মজিদ, খালেক ব্যাপারী উ: (গ)

...মোনাজাত শেষে মজিদ কোন দিকে পা ফেলেছিল?
...পূর্ব (খ) উত্তর (গ) পশ্চিম (ঘ) দক্ষিণ উ: (খ)

...আমেনা বিবি ও রহিমার মধ্যে কোন বিষয়টিতে মিল রয়েছে?
...শারীরিক সৌন্দর্যে (খ) চালচলনে (গ) মানসিকতায় (ঘ) নিঃসন্তান হওয়ার উ: (ঘ)

...আমেনাকে কিভাবে মাজার ঘরে আনা হয়?
...ঘোড়ার গাড়িতে (খ) মহিষের গাড়িতে (গ) গরুর গাড়িতে (ঘ) পালকিতে উ: (ঘ)

...র শ্বশুর হয়?
...মজিদ (খ) খালেক ব্যাপারী (গ) মোদাব্বের মিয়া (ঘ) তাহেরের বাপ উ: (ঘ)

...সুন্দর কে?
...জমিলা (খ) রহিমা (গ) আমেনা (ঘ) তানু বিবি উ: (ক)

...র পায়ের মাটিতে আওয়াজ হয়?
...জমিলা (খ) রহিমা (গ) হাসুনির মা (ঘ) আমেনা বিবি উ: (খ)

...খালেক ব্যাপারীর মতে আক্কাস দাড়ি রাখেনি কেন?
...বিদেশে ছিল বলে (খ) ইংরেজি পড়েছে বলে (গ) আধুনিক বলে (ঘ) বিদেশে ছিল বলে উ: (খ)

...একদিন মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করেছিল কে?
...হাসুনির মা (খ) তানু বিবি (গ) খ্যাংটা বুড়ি (ঘ) জমিলা উ: (গ)

...নামাজের সময় সিজদায় গিয়ে কে আর উঠেনি?
...রহিমা (খ) আমেনা (গ) জমিলা (ঘ) হাসুনির মা উ: (গ)

৪৬. 'পাক দিল আর গুনাগার দিল, যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুনাগার দিলের শাস্তি দিবার চায়, তখন পাক দিলই শাস্তি পায়।' কার উদ্দেশে এ উক্তিটি করা হয়েছে?
(ক) তাহেরের বাপ (খ) খালেক ব্যাপারী (গ) আক্কাসের বাবা (ঘ) মতলুব খাঁ উ: (খ)

৪৭. গ্রামে কীসের হিড়িক পড়েছে?
(ক) মসজিদ স্থাপনের (খ) বাঁজা বউদের দূর করার
(গ) মাজার নির্মাণের (ঘ) কবর বাঁধাইয়ের উ: (খ)

৪৮. 'তাদের দিল সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো'- কাদের?
(ক) মতিগঞ্জের মানুষদের (খ) গারো পাহাড়ের লোকদের
(গ) মহব্বতনগরের লোকদের (ঘ) মধুপুরের অধিবাসীদের উ: (খ)

৪৯. আমেনা বিবির আনন্দ আর সুখের নিশানা কী?
(ক) খোতা মুখের তালগাছ (খ) তেঁতুলগাছ (গ) মাজার (ঘ) বড় নদী উ: (ক)

৫০. 'তাছির' শব্দের অর্থ কী?
(ক) তোয়াজ করা (খ) পরিচর্যা করা (গ) প্রতিবাদ করা (ঘ) প্রভাব উ: (ঘ)

৫১. আক্কাসের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) ধর্মান্ধ (খ) প্রগতিশীল (গ) মানবতাবাদী (ঘ) জনসেবক উ: (খ)

৫২. 'পৌরুষের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।' 'লালসালু' উপন্যাসে এ মনোভাবটি কার?
(ক) তাহেরের (খ) খালেক ব্যাপারীর (গ) মজিদের (ঘ) ঢেঙা বুড়োর উ: (ঘ)

৫৩. কার বাড়ির সামনেকার মাঠে লোকে-লোকারণ্য ছিল?
(ক) খালেক ব্যাপারীর (খ) মজিদের (গ) মতলুব মিঞার (ঘ) ঢেঙা বুড়োর উ: (গ)

৫৪. আওয়ালপুরের পিরের মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) হিংসা (খ) ধর্মান্ধতা (গ) ধর্মব্যবসা (ঘ) সাধুতা উ: (গ)

৫৫. আওয়ালপুরের পির আছরের সময় কোন নামাজ পড়েছিল?
(ক) ফজর (খ) জোহর (গ) মাগরিব (ঘ) এশা উ: (খ)

৫৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয়ে এম.এ ভর্তি হন?
(ক) দর্শন (খ) সাহিত্য (গ) ইতিহাস (ঘ) অর্থনীতি উ: (ঘ)

৫৭. আওয়ালপুরের পিরের প্রতি আমেনার কী প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) ক্রোধ (খ) অবিশ্বাস (গ) ক্ষোভ (ঘ) অন্ধবিশ্বাস উ: (ঘ)

৫৮. মজিদ হাসপাতালে গিয়েছিল কেন?
(ক) সমবেদনা প্রকাশ করতে (খ) রোগীর সেবা দিতে
(গ) ডাক্তার দেখাতে (ঘ) রোগীর সঙ্গে আলাপ করতে উ: (ক)

৫৯. ধলা মিয়া খালেক ব্যাপারীর সম্পর্কে কী হয়?
(ক) শ্যালক (খ) ভাই (গ) চাচা (ঘ) মামা উ: (ক)

৬০. ধলা মিয়াকে ব্যাপারী আওয়ালপুরে যেতে বলেছিল কেন?
(ক) আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে (খ) পিরের সাথে দেখা করতে
(গ) ব্যবসায়ের কাজে (ঘ) পানিপড়া আনতে উ: (ঘ)

৬১. ধলা মিয়ার দেবংশি তেঁতুল গাছকে ভয় পাওয়ার মধ্যে কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) কুসংস্কারে বিশ্বাস (খ) সংস্কারে বিশ্বাস (গ) পুরনো ধ্যানধারণা (ঘ) অসতর্ক অবস্থান উ: (ক)

৬২. মজিদ বারবার ধলা মিয়াকে আওয়ালপুরে যেতে বলায় কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) দৃঢ়তা (খ) কঠোরতা (গ) হিংসা (ঘ) ক্ষোভ উ: (ঘ)

৬৩. আওয়ালপুরের পিরকে মজিদ কী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে?
(ক) ঠগবাজ (খ) মিথ্যাবাদী (গ) ইবলিশ (ঘ) ভণ্ড উ: (গ)

৬৪. নিদারুণ ভয়ে কে অসাড় হয়ে যায়?
(ক) রহিমা (খ) জমিলা (গ) আমেনা বিবি (ঘ) ধলা মিঞা উ: (ক)

৬৫. 'আমেনা'র ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) সুখী (খ) নিঃসন্তান (গ) দরিদ্র (ঘ) কুৎসিত উ: (খ)

৬৬. ঢেঙা বুড়োর স্ত্রীর জানাজা পড়ানোর কথা ছিল কার?
(ক) মজিদের (খ) মতলুব খাঁর
(গ) মোল্লা শেখের (ঘ) আওয়ালপুরের পিরের উ: (গ)

৬৭. 'তানি যে খোদার মানুষ' কে?
(ক) মজিদ (খ) খালেক ব্যাপারী (গ) মতলুব খাঁ (ঘ) আওয়ালপুরে পির উ: (ক)

৬৮. উঠানের পথটুকু পাড়ি দিতে আমেনা বিবি পরিশ্রান্ত বোধ করে কেন?
(ক) শারীরিক দুর্বলতায় (খ) অসুস্থতায় (গ) মাজারের ভয়ে (ঘ) তানুবিবির কারণে উ: (ক)

৬৯. পানিপড়ায় বিশ্বাস স্থাপন আধুনিক বিজ্ঞানে কী হিসেবে বিবেচ্য?
(ক) সংস্কার (খ) কুসংস্কার (গ) নেক কাজ (ঘ) পবিত্র কাজ উ: (খ)

৭০. আমেনা বিবিকে পালকি থেকে নামিয়ে মজিদ কোথায় নিতে বলেছিলেন?
(ক) ঘরে (খ) উঠানে (গ) বারান্দায় (ঘ) মাজারে উ: (ঘ)

৭১. মজিদ বারবার আমেনা বিবির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল কেন?
(ক) মনোভাব বুঝতে (খ) কড়া শাসনে রাখতে (গ) ভীতি সৃষ্টিতে (ঘ) রূপের মোহে উ: (ঘ)

৭২. মজিদের সামনে খালেক ব্যাপারী অসহায় কেন?
(ক) ক্ষমতার দুর্বলতায় (খ) ভক্তি-শ্রদ্ধায় (গ) ধর্মভীতির কারণে (ঘ) অভিশাপের ভয়ে উ: (গ)

৭৩. আমেনা বিবি মাজারে পাক কোন দিক থেকে শুরু করেছিল?
(ক) ডান দিকে (খ) বাঁ দিক (গ) পূর্ব দিক (ঘ) উত্তর দিক উ: (ক)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৭৪. আমেনা বিবিকে তালাক দেওয়ানোর মূল কারণ কী ছিল?
(ক) মজিদের আত্মঅহমিকায় আঘাত (খ) খালেক ব্যাপারীর মানসিক যন্ত্রণা
(গ) আমেনার চারিত্রিক ত্রুটি (ঘ) সন্তান দানে অক্ষমতা [উ:ক]

৭৫. 'খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা' উক্তিটি কার?
(ক) কাদেরের (খ) মজিদের (গ) তাহেরের (ঘ) মোদাচ্ছের পীরের [উ:খ]

৭৬. 'কলমা জানো মিঞা?' 'লালসালু' উপন্যাসে প্রশ্নটি কাকে করা হয়েছে?
(ক) আক্কাসকে (খ) দুদু মিঞাকে (গ) সোলেমানকে (ঘ) মোদাব্বের মিঞাকে [উ:খ]

৭৭. রহিমা মাজারে আমেনা বিবির দৃশ্যগুলো কীভাবে দেখেছিল?
(ক) অপলক দৃষ্টিতে (খ) ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে
(গ) বেড়ার ফুটো দিয়ে (ঘ) জানালা দিয়ে [উ:গ]

৭৮. আমেনা বিবি মাজারের মধ্যে মূর্ছা গিয়েছিল কেন?
(ক) ভয়ে (খ) মজিদের অলৌকিক ক্ষমতায় (গ) মাজারের ক্ষমতায় (ঘ) শারীরিক দুর্বলতায় [উ:ঘ]

৭৯. খালেক ব্যাপারীর গলায় শিশুর ভাব আসে কেন?
(ক) ভয়ে (খ) ক্রোধে (গ) সন্দেহে (ঘ) বিশ্বাসে [উ:গ]

৮০. আমেনা বিবির ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
(ক) অশান্ত (খ) স্বামীভীরু (গ) শক্তিশালী (ঘ) সমাজ-বিদ্বেষী [উ:খ]

৮১. মজিদ আক্কাসকে দমাতে চাওয়ায় তার চরিত্রের কোন বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে?
(ক) হিংসা (খ) অজ্ঞতা (গ) শোষণ (ঘ) বিদ্বেষ [উ:গ]

৮২. 'বেত্তমিজের মতো কথা কইস না' উক্তিটি কার সম্পর্কে করা হয়েছিল?
(ক) আক্কাস (খ) তাহের (গ) কাদের (ঘ) ধলা মিঞা [উ:ক]

৮৩. মহব্বতনগর গ্রামের বড় মসজিদ নির্মাণে বারো আনা ব্যয় বহন করতে চেয়েছিল–
(ক) মজিদ (খ) খালেক ব্যাপারী (গ) মোদাব্বের আলী (ঘ) মতলুব খাঁ [উ:খ]

৮৪. 'মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে' এখানে অন্য কথা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) দ্বিতীয় বিয়ে (খ) সম্পত্তির লোভ (গ) বদ মতলব (ঘ) হীনস্বার্থ [উ:ক]

৮৫. একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ সোনালি মিহির সুন্দর কীসের ঝংকার শুনতে পায়?
(ক) নূপুরের (খ) হাসির (গ) সুরের (ঘ) গানের [উ:খ]

৮৬. মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে-দলে লোক চলেছে কোন দিকে?
(ক) পূর্ব দিকে (খ) পশ্চিম দিকে (গ) উত্তর দিকে (ঘ) দক্ষিণ দিকে [উ:গ]

৮৭. মহব্বতনগর গ্রামের কয় গ্রাম পরে নতুন পির সাহেব এসেছে?
(ক) তিন গ্রাম (খ) চার গ্রাম (গ) পাঁচ গ্রাম (ঘ) ছয় গ্রাম [উ:ক]

৮৮. ঝড়ের সময় ঢেঙা বুড়ো কী খেতে চেয়েছিল?
(ক) গুড় (খ) চিনি (গ) মুড়ি (ঘ) চিঁড়া [উ:ঘ]

৮৯. আওয়ালপুরের পিরের পূর্বপুরুষেরা কোন এলাকা থেকে এসেছেন?
(ক) এশিয়া (খ) মধ্যপ্রাচ্য (গ) দক্ষিণ আমেরিকা (ঘ) আফ্রিকা [উ:খ]

৯০. 'লালসালু' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশক কে?
(ক) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (খ) সৈয়দ হাবিবুল্লাহ (গ) মুহম্মদ আতাউল্লাহ (ঘ) নওরোজ কিতাবিস্তান [উ:গ]

৯১. 'লালসালু' উপন্যাসে 'মেয়েলোকের মক্করা' বলতে বোঝানো হয়েছে–
(ক) নারীর অধিকার চেতনা (খ) নারী স্বাধীনতা (গ) নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা (ঘ) নারীর হাসি-তামাশা [উ:গ]

৯২. আমেনা বিবির সতিন কে?
(ক) রহিমা বিবি (খ) জমিলা (গ) তানু বিবি (ঘ) হাসুনির মা [উ:গ]

৯৩. মজিদের জমি-জায়গার সাথে সাথে আরও কী বাড়ে?
(ক) অর্থ (খ) পরিচিতি (গ) খ্যাতি (ঘ) সম্মান [উ:ঘ]

৯৪. আগত পির সাহেব সম্পর্কে লোকে কী বলে?
(ক) তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল (খ) মরা মানুষ জিন্দা করতে পারত
(গ) এককালে তার চোখে আগুন ছিল (ঘ) সহি পিরের খাঁটি ক্ষমতা ছিল [উ:খ]

৯৫. 'কী মিয়া, তোমার দিলে কি ময়লা আছে? এখানে 'ময়লা' শব্দটি কী অর্থে প্রয়োগ ঘটেছে?
(ক) কুমতলব (খ) সন্দেহ (গ) অপবিশ্বাস (ঘ) শয়তানি [উ:ক]

৯৬. 'আপনারা জাহেল, বে-এলেম, আনপাড়হ' কারা?
(ক) নোয়াখালিবাসী (খ) আওয়ালপুরবাসী (গ) মতিগঞ্জবাসী (ঘ) মহব্বতনগরবাসী [উ:ঘ]

৯৭. মজিদ যখন জমিলাকে বিয়ে করতে যায়, তখন জমিলা তাকে দেখে কী ভেবেছিল?
(ক) দুলার বাপ (খ) দুলার বড় ভাই (গ) দুলার চাচা (ঘ) দুলার দাদা [উ:ক]

৯৮. 'তাই তারা ছোটে', 'ছোটে'- কেন?
(ক) ধর্মের জন্য (খ) জীবিকার জন্য (গ) কল্যাণের জন্য (ঘ) সুবিধার জন্য [উ:খ]

৯৯. কাদের ছান বেহেশত সুনির্দিষ্ট?
(ক) আলেম (খ) মৌলবি (গ) মাওলানা (ঘ) হাফেজ [উ:ঘ]

১০০. 'লালসালু' উপন্যাসে কোন অঞ্চলের জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে?
(ক) নোয়াখালী (খ) সিলেট (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) বান্দরবান [উ:ক]

১০১. 'অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ' এখানে 'সাপের মতো' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) নীরবতা (খ) হিংস্রতা (গ) বিষাক্ততা (ঘ) উপকারিতা [উ:খ]

১০২. আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন?
(ক) মজিদকে গ্রামছাড়া করতে (খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে
(গ) গোঁড়ামি দূর করতে (ঘ) গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করতে [উ:ঘ]

১০৩. 'শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে যে গন্ধ' এখানে কোন গন্ধের কথা বলা হয়েছে?
(ক) ধোঁয়ার গন্ধ (খ) আবর্জনার গন্ধ (গ) ধানের গন্ধ (ঘ) পিঠার গন্ধ [উ:গ]

১০৪. রেলগাড়ির খুপরিতে অনেকের দেহে শেষ পর্যন্ত কী থাকে না?
(ক) কাপড় (খ) বল (গ) চেতনা (ঘ) তাবিজ [উ:গ]

১০৫. দশ কথায় রাও নেই কার?
(ক) রহিমার (খ) বুড়ির (গ) হাসুনির মার (ঘ) তাহেরের বাপের [উ:গ]

১০৬. পিরের মাজারকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
(ক) লালসালুর (খ) মাঠের সঙ্গে (গ) মাছের পিঠের সঙ্গে (ঘ) উটের পিঠের সঙ্গে [উ:গ]

১০৭. 'এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোক ছিল।' 'লালসালু' উপন্যাসে উল্লেখকৃত বুড়ো কে?
(ক) মজিদ (খ) খালেক ব্যাপারী (গ) আওয়ালপুরের পির (ঘ) ঢেঙা বুড়ো [উ:গ]

১০৮. মানুষের রসনা কার রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে মজিদ মনে করে?
(ক) আগুনের (খ) সাপের (গ) বাঘের (ঘ) জন্তু-জানোয়ারের [উ:গ]

১০৯. মাজারে রহিমা কাদের জন্য দোয়া করে থাকে?
(ক) মহব্বতনগরবাসীর জন্য (খ) মানবজাতির জন্য
(গ) বাপের বাড়ির মানুষের জন্য (ঘ) শ্বশুরবাড়ির জন্য [উ:গ]

১১০. 'লালসালু' উপন্যাসে নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে কী ছিল?
(ক) রাগ (খ) ক্ষোভ (গ) প্রতিহিংসা (ঘ) আগুন [উ:গ]

১১১. 'তাকিয়ে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে' কোথায়?
(ক) জমিতে (খ) মাজারে (গ) হাট-বাজার (ঘ) সড়কে [উ:গ]

১১২. মজিদ আমেনা বিবির চিকিৎসার ভার নিয়েছিল কেন?
(ক) স্ত্রীর ক্ষমতা বোঝাতে (খ) ব্যাপারীর অনুরোধে
(গ) প্রতিশোধের মোহে (ঘ) রহিমার অনুরোধে [উ:গ]

১১৩. আওয়ালপুরের পির কোন ভাষায় বয়ান করেন?
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) উর্দু (ঘ) হিন্দি [উ:গ]

১১৪. 'অগো কথা হুনলে পুরুষ মানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়।' উক্তিটি কার?
(ক) মজিদের (খ) খালেক ব্যাপারীর
(গ) আওয়ালপুরের পির সাহেবের (ঘ) মোদাচ্ছের পীরের [উ:গ]

১১৫. উপন্যাসের কোন চরিত্রটি মজিদকে ভীত, উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করেছে?
(ক) রহিমা (খ) জমিলা (গ) আমেনা (ঘ) হাসুনির মা [উ:গ]

১১৬. সারিবদ্ধ হয়ে মজুররা কীসের মতো কাস্তে নিয়ে ধান কাটে?
(ক) দ্বিতীয়ার তারার মতো (খ) দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো (গ) ধনুকের মতো (ঘ) তীরের মতো [উ:গ]

১১৭. মহব্বতনগর গ্রামের লোকগুলো ইদানীং কেমন হয়ে উঠেছে?
(ক) পরহেজগার (খ) দরিদ্র (গ) অবস্থাপন্ন (ঘ) কবর ব্যবসায়ী [উ:গ]

১১৮. ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে ছোটাছুটি করত কে?
(ক) জমিলা (খ) রহিমা (গ) হাসুনির মা (ঘ) আমেনা [উ:গ]

১১৯. মজিদ বুড়োকে মাজারে পাঁচ পয়সার শিরনি দিতে বলে কেন?
(ক) দান হিসেবে (খ) মানত হিসেবে (গ) শাস্তি হিসেবে (ঘ) মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় [উ:গ]

১২০. 'হা-শূন্য' কথাটির অর্থ কী?
(ক) ঋণগ্রস্ত (খ) রোগগ্রস্ত (গ) অভাবগ্রস্ত (ঘ) মানসিক বিকারগ্রস্ত [উ:গ]

১২১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল কোনটি?
(ক) ঢাকা (খ) কলকাতা (গ) প্যারিস (ঘ) করাচি [উ:গ]

১২২. মজিদ কীভাবে তার ক্ষমতা ও প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে?
(ক) মানুষকে অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন করে (খ) মানুষের সঙ্গে ভলো ব্যবহার করে
(গ) নিজের অঢেল অর্থের জোরে (ঘ) অলৌকিক ক্ষমতা বলে [উ:ঘ]

১২৩. মজিদ কাকে ভয় পায়?
(ক) জমিলাকে (খ) আওয়ালপুরের পিরের ক্ষমতাকে (গ) আক্কাসকে (ঘ) ব্যাপারীকে [উ:খ]

১২৪. হাসুনির মা মজিদের কাছে যায় কেন?
(ক) নালিশ করতে (খ) সাহায্য চাইতে (গ) কাজ চাইতে (ঘ) বাবার জন্য ক্ষমা চাইতে [উ:ঘ]

১২৫. 'থাক কইবার দাও। খোদাই তার শাস্তি করবো।' উক্তিটি কার?
(ক) তাহেরের (খ) কাদেরের (গ) রতনের (ঘ) হাসুনির মার [উ:খ]

১২৬. 'হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেওগো বিটি' মজিদ এ কথা কাকে বলে?
(ক) রহিমাকে (খ) জমিলাকে (গ) হাসুনির মাকে (ঘ) হাসুনিকে [উ:গ]

১২৭. 'লালসালু' উপন্যাসে 'বাহে মুলুক' বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে?
(ক) পূর্ববঙ্গ (খ) পশ্চিমবঙ্গ (গ) উত্তরবঙ্গ (ঘ) দক্ষিণবঙ্গ [উ:গ]

১২৮. 'লালসালু' উপন্যাসে গ্রামের মানুষ জাঁদরেল পিরের কাছে যায় কেন?
(ক) ধর্ম শিক্ষার জন্য (খ) ঝাড়ফুঁকের জন্য
(গ) জান্নাত লাভের জন্য (ঘ) মনোবাসনা পূরণের জন্য [উ:ঘ]

১২৯. 'কথাডা জানি আপনার বইনে না হুনে' 'লালসালু' উপন্যাসে উক্তিটি কার?
(ক) মজিদের (খ) রহিমার (গ) খালেক ব্যাপারীর (ঘ) জমিলার [উ:গ]

১৩০. 'গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।' উক্তিটির মর্মকথা কী?
(ক) ক্ষুধা-তৃষ্ণার কাছে সব ম্লান (খ) নির্যাতিতদের আর্তনাদ
(গ) প্রতিবাদী চেতনা (ঘ) ক্ষুধা দারিদ্র্যপীড়িত জীবন [উ:ঘ]

১৩১. এক সময় মজিদ কার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়?
(ক) মাজারের (খ) রহিমার (গ) জমিলার (ঘ) খালেক ব্যাপারী [উ:খ]

১৩২. 'মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে' 'মেয়েটাকে' বলতে বোঝানো হয়েছে–
(ক) রহিমাকে (খ) জমিলাকে (গ) হাসুনির মাকে (ঘ) হাসুনিকে [উ:গ]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST MCQ

মজিদ কোন দৃষ্টিতে ধানকাটা দেখে?
ক সাবধানী দৃষ্টিতে খ শ্যেন দৃষ্টিতে গ কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘ প্রসন্ন দৃষ্টিতে

'লালসালু' উপন্যাসে বুড়ি চুপ থাকে কেন?
ক সবাই তাকে দোষ দেয় বলে খ স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলায়
গ খোলোয়াড় না থাকায় খেলা জমে না বলে ঘ কথা বলার দোসর নেই বলে

'কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা'–
ক খালেক ব্যাপারীর খ আমেনার গ তাহেরের বাপের ঘ আক্কাসের

'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' (১৯৬৫) গল্পটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
ক দুই তীর ও অন্যান্য গল্প খ নয়নচারা গ চাঁদের অমাবস্যা ঘ তরঙ্গভঙ্গ

একালে উড়ুনি মেয়ে ছিল কে?
ক জমিলা খ রহিমা গ আমেনা বিবি ঘ বুড়ি

দেশে দেশে পিরদের সফর শুরু হয় কখন?
ক যখন গোলায় গোলায় ধান ওঠে খ যখন দুর্ভিক্ষ হয়
গ যখন গ্রামে উৎসব হয় ঘ যখন রোগের প্রকোপ হয়

বেপারির অসহায়ত্বের মধ্যে কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক অলৌকিক শক্তির কাছে দীন খ প্রতারণার ফাঁদে নিরুপায়
গ কূটকৌশলের কাছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঘ অন্ধবিশ্বাসে বলীয়ান

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিস্তান সরকারের কোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন?
ক শিক্ষা বিভাগ খ বৈদেশিক বিভাগ গ সংস্কৃতি বিভাগ ঘ অর্থনৈতিক বিভাগ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি কোনটি?
ক দুই তীর খ কাঁদো নদী কাঁদো গ লালসালু ঘ তরঙ্গভঙ্গ

'লালসালু' উপন্যাসের মূল বক্তব্য হলো–
ক সামাজিক অনাচার রোধ খ সামাজিক কুসংস্কার
গ ধর্মীয় গোঁড়ামির নিঃশেষ ঘ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ

'লালসালু' উপন্যাসে কার অন্তরে কুটিলতা আর অবিশ্বাস?
ক মজিদের খ খালেক ব্যাপারীর গ তাহের-কাদেরের বাপের ঘ রহিমার

'সন্ধানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।' উক্তিটির তারা হলো–
ক নতুন পির ও মজিদ খ খালেক ব্যাপারী ও মজিদ
গ নতুন পির ও খালেক ব্যাপারী ঘ খালেক ব্যাপারী ও ধলা মিয়া

'তার বিচ্ছুরিত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে।' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে মজিদের–
ক মনের সংশয় খ মনের ভয় গ মনের ক্রোধ ঘ মনের হতাশা

'তোমার দাড়ি কই মিঞা?' এ কথার উদ্দেশ্য–
ক ধর্মপরায়ণতা খ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করা
গ ধর্মে অনুপ্রাণিত করা ঘ বাৎসল্য

রহিমা ও হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করার সময় মজিদ বারবার ঘরের বাইরে আসছিল কারণ–
ক অসুস্থতা খ সমবেদনা গ সাহায্য করা ঘ আদিম লালসা

'শয়তানকে তাড়াবার জন্যই শিলা ছোড়ে খোদা' কথাটি–
ক আংশিক সত্য খ আংশিক মিথ্যা গ অসত্য ঘ সামান্য সত্য

মাজারে তাহেরের বাপকে মজিদ কয় পয়সার শিরনি দিতে বলে?
ক চার খ পাঁচ গ ছয় ঘ সাত

হাসি কাদের প্রাণ?
ক শিশুদের খ গাঁয়ের মানুষদের গ মজিদের ভক্তদের ঘ মজুরদের

আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে কী গাছ পড়ে?
ক তেঁতুলগাছ খ অশ্বত্থগাছ গ বটগাছ ঘ ছাতিমগাছ

মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে কেন?
ক প্রখর রোদে খ প্রচণ্ড রাগে গ মজুরদের গীত শুনে ঘ প্রতিহিংসার কারণে

ধূর্ত, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী-এ বৈশিষ্ট্যগুলো 'লালসালু' উপন্যাসে কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
ক মজিদ খ তাহের গ কাদের ঘ ব্যাপারী

'লালসালু' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু কোনটি?
ক প্রগতিশীলতা খ গ্রামীণ জীবন
গ নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন ঘ কুসংস্কার ও গোঁড়ামি

কবরের গায়ে কী লেগে ছিল?
ক জমিলার হাত খ জমিলার পা গ জমিলার মাথা ঘ জমিলার মুখ

কার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়?
ক ব্যাপারীর খ মজিদের গ আক্কাসের ঘ রহিমার

হাসুনির মা প্রথম প্রথম মজিদের বাড়ি আসত না কেন?
ক অভিমান ছিল বলে খ রাগ ছিল বলে গ লজ্জার কারণে ঘ ঘৃণা লাগত বলে

ঘরের ম্লান আলোয় কবরের অনাবৃত অংশটা কিসের সাথে তুলনীয়?
ক মৃত মানুষের খোলা চোখের খ উজ্জ্বল রূপালি
গ মাছের পিঠের মতো ঘ ঘোড়ার চোখের মতো

সভায় ভুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ঢাকা পড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য?
ক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা খ মসজিদ নির্মাণের কথা
গ রাস্তা নির্মাণের কথা ঘ গ্রামোন্নয়নের কথা

'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ কোন সময় আওয়ালপুর গ্রামে গিয়েছিল?
ক ভোরে খ দুপুরের পূর্বে গ সূর্য হেলে পড়লে ঘ বিকালে

কোঁচ কী?
ক হরিণ শিকারের যন্ত্রবিশেষ খ কুমির শিকারের যন্ত্রবিশেষ
গ মাছ ধরার যন্ত্রবিশেষ ঘ পাখি শিকারের যন্ত্রবিশেষ

'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ গ্রামের সভায় কী নির্মাণের কথা বলেছে?
ক মাদ্রাসা খ মসজিদ গ সরাইখানা ঘ মাজার

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ
২৬.ক খ গ ঘ	২৭.ক খ গ ঘ	২৮.ক খ গ ঘ	২৯.ক খ গ ঘ	৩০.ক খ গ ঘ

Answer

৩০.খ	২৯.গ	২৮.গ	২৭.খ	২৬.ক	২৫.গ	২৪.ঘ	২৩.খ	২২.ঘ	২১.ক
২০.গ	১৯.ক	১৮.খ	১৭.খ	১৬.গ	১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.খ	১২.খ	১১.গ
১০.খ	০৯.গ	০৮.খ	০৭.গ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.ক	০৩.গ	০২.গ	০১.খ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'লালসালু' উপন্যাসে মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে কীভাবে?
০২. 'লালসালু' উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
০৩. 'ও কি ঘরে বালা আনবার চায়?' কাকে উদ্দেশ্য করে মজিদ এ কথা বলেছে?
০৪. মজিদের পাগড়ির পেছনটায় কতখানি লেজ ছিল?
০৫. মজিদের কী খাওয়ার অভ্যাস ছিল?
০৬. 'মজিদের উত্থানের পেছনে গ্রামবাসীর ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষায়ই দায়ী।' ব্যাখ্যা কর।
০৭. 'জমিলা বয়সোচিত চাঞ্চল্য ও প্রতিবাদী সত্তার স্বরূপ।' ব্যাখ্যা কর।
০৮. 'ধর্মান্ধতা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।' মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।
০৯. 'লালসালু' উপন্যাসে আমেনা বিবির সংসার ভাঙার পেছনে মজিদ কতটুকু দায়ী।
১০. 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে মজিদ চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

উত্তর :

০১. খড়কুটোর আলোয় প্রাঙ্গণ আলোকিত হলেও আকাশ অন্ধকার তাই।
০২. ১৯৪৮ সালে।
০৩. জমিলাকে।
০৪. বিঘত খানেক।
০৫. হুঁকা।
০৬. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৭. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৮. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৯. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
১০. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

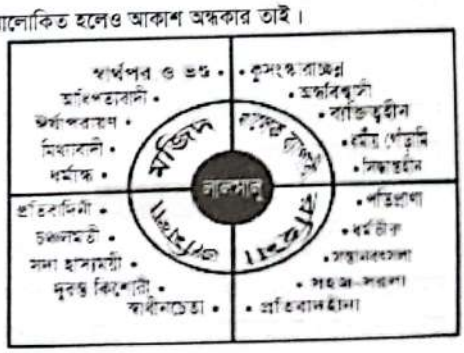

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS